গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৫ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২১ - ২৭ ডিসেম্বর, ২০১২ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

ঘুষের কারবারে ওয়ালমার্ট

ভারতে খুচরো ব্যবসার বাজারে ঢুকতে লবি করার জন্য ২৫ মিলিয়ন ডলার বা ১২৫ কোটি টাকারও বেশি খরচ করেছে ওয়ালমার্ট। গত ৯ ডিসেম্বর আমেরিকার সেনেট এই তথ্য দিয়েছে। মার্কিন সেনেট, হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস, মার্কিন ট্রেড রিপ্রেজেনটেটিভ ও মার্কিন বিদেশ দপ্তরে এই কাজের তদ্বির করতে শুধু ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকেই ১০ কোটি টাকা খরচ করেছে এই বহুজাতিক। ২০১২ সালে এখনও পর্যন্ত মোট খরচ করেছে ১৮ কোটি টাকা।

স্বাভাবিকভাবেই অভিযোগ উঠেছে, ভারতের রাজনৈতিক মহলে প্রভাব খাটানোর জন্যও ঘুষ দেওয়া হয়েছে। ওয়ালমার্ট এ কথা অস্বীকার করলেও খুচরো ব্যবসায় এফ ডি আই নিয়ে ভোটাভুটির দিনে সংসদে যে নাটক দেখা গেল, তার পিছনে এমনই কোনও ঘটনা থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

বাংলাদেশে ওয়ালমার্টের কারখানায় বলি শ্রমিকরা

বহুজাতিক কোম্পানিগুলি তাদের কাজ হাসিল করার জন্য আমেরিকার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে প্রভাব বিস্তার করতে এজেন্ট নিয়োগ করে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, আইনজীবী, প্রভাবশালী আমলা, রাজনীতিবিদরা তাদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। উদ্দেশ্য বহুজাতিকটির ব্যবসা সম্প্রসারণ বা তার মুনাফার স্বার্থে সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করা। একেই বলে লবি করা। আমেরিকার মতো গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী দেশে এইভাবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির স্বার্থেই নীতি তৈরি হয়। এরা এতই প্রভাবশালী যে প্রকাশ্যেই এই লবি চলে। মার্কিন আইনে তার অনুমোদনও আছে। গণতন্ত্রের মহিমা এমন যে, আইনসভার সদস্যরা অর্থের বিনিময়ে গলা ফাটিয়ে নিজের নিজের মক্কেলের জন্য তদ্বির করেন। বেশ কিছু সংস্থা গড়ে উঠেছে তাদের কাজ লবি করার জন্য জনপ্রতিনিধি বা অন্যান্য পেশাদারদের ভাড়া করে চুক্তির ভিত্তিতে লবি করানো। ওয়ালমার্টও ভারতে তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্য মার্কিন আইনসভা ও কূটনীতিকদের অর্থের বিনিময়ে কাজে লাগিয়েছে। অনেকেরই হয়তো স্মরণে আছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে ওবামা বলেছিলেন, ভারতের উচিত খুচরো ব্যবসায় অবাধ-বিদেশি বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়া। ভারতে খুচরো ব্যবসায় এফ ডি আই-এর সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হতে মার্কিন সেনেটে রীতিমত উল্লাসধ্বনি শোনা গিয়েছিল। শুধু ওয়ালমার্ট নয়, একইভাবে ভারতের বাজারে ঢুকতে কমপক্ষে আরও ১৫টি মার্কিন সংস্থা লবি করছে বলে সে দেশের সেনেটে জানানো হয়েছে।

ভারতে এই ভাবে লবি করা আইন বিরুদ্ধ

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিধানসভায় হাতাহাতি লজ্জাজনক

বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএম দলের বিধায়কদের মধ্যে ১১ ডিসেম্বর মারপিটের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু এক বিবৃতিতে বলেন —

"বিধানসভায় সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কদের মধ্যে হাতাহাতি ও মারপিটের যে ঘটনা ঘটেছে, তা এককথায় চরম লজ্জাজনক ও বিধানসভার মর্যাদার পক্ষে চূড়ান্ত অবমাননাকর। জনগণ যাঁদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছেন, তাঁদের কাছে তো জনগণের প্রত্যাশা অনেক। এই জনপ্রতিনিধিদের জন্যই জনসাধারণের কাছ থেকে ট্যাক্স বাবদ সংগৃহীত কোটি কোটি টাকা সরকারকে প্রতি বছর খরচ করতে হয়। সেই প্রতিনিধিরা যদি বিধানসভায় সুস্থ ও রুচিশীল আচরণ না করেন, জনগণের স্বার্থ নিয়ে যুক্তিপূর্ণ বিতর্কের পরিবর্তে গায়ের জোরেই সবকিছু মীমাংসা করতে চান এবং মারপিটে পরস্পর জড়িয়ে পড়েন, কোনওরকম শালীনতা ও সংযমের তোয়াক্কা না করেন, তবে তার থেকে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু হতে পারে না। আমরা বিধানসভায় ঐ দুটি দলের আচরণের তীব্র নিন্দা করছি।"

স্বল্পমূল্যে ওষুধ ঃ স্বস্তি না প্রতারণা

অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে মমতা ব্যানার্জীর সরকার গত ১১ ডিসেম্বর রাজ্যের ৬টি হাসপাতালে স্বল্পমূল্যের ওষুধের দোকান চালু করে। হাসপাতালগুলি হল কলকাতা মেডিকেল কলেজ, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল, মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ, বারাসত জেলা হাসপাতাল, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল। স্বাস্থ্যভবন সূত্রে বলা হয়েছে, এরকম ৩৫টি দোকান খোলা হবে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয়, এইসব দোকানগুলিতে ৪৮ থেকে ৬৭.২৫ শতাংশ কম দামে ওষুধ পাওয়া যাবে। বাজারে এখন ওষুধ অগ্নিমূল্য। সমীক্ষা বলছে, ওষুধ কোম্পানিগুলি ওষুধের উপর একশ থেকে চার হাজার শতাংশ পর্যন্ত লাভ করছে। দেশের সাধারণ মানুষদের একটা বিরাট অংশ চিকিৎসা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। ফলে কম দামে ওষুধ পাওয়ার সংবাদে অনেকেই আশা করেছিলেন যে তাদের কিছুটা স্বস্তি মিলবে। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল, এর পিছনে রয়েছে অন্য পরিকল্পনা। যে সব সংস্থাকে সরকার হাসপাতালে ওষুধের দোকান খোলার বরাত দিয়েছে তারা খোলা বাজারের থেকে এত বেশি দাম ধার্য করেছে যে, ডিসকাউন্ট দিয়েও তার দাম খোলা বাজারের থেকে বেশি। পিপিপি মডেলে এই ধরনের ওষুধের দোকান সিপিএম সরকারও চালু করেছিল নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে ও এম আর বাঙ্গুর হাসপাতলে। সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টর ফোরামের বক্তব্য, পিপি পি মডেলের ঐসব দোকানগুলি তৈরি করার জন্য সরকার হাসপাতালের বাড়ি, বিদ্যুৎ, জল বিনাপয়সায় দিয়েছিল পিপিপির ব্যবসায়ী অংশীদারকে। তদানীন্তন সরকার ঘোষণা করেছিল, ঐসব দোকান থেকে কম দামে জেনেরিক নামের ওষুধ সরবরাহ করা হবে। ফলে মানুষকে বাজার থেকে চড়া দামে ওষুধ আর

ছয়ের পাতায় দেখুন

মাফ করবেন, ওবামার অশ্রুপাতকে খাঁটি বলা যাচ্ছে না

আমেরিকার শিশু বিদ্যালয়ে আবার আততায়ীর নির্বিচার গুলিতে ২০ জন শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু সমগ্র বিশ্বের মানুষকে হতবাক করেছে, শোকে দুঃখে কাতর করেছে। আবার ঐ স্কুলেরই প্রধান শিক্ষিকা ডন লাফার্টি হচ স্নাং যেভাবে সহকর্মীদের বাঁচাতে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে ঘাতকের দিকে ধেয়ে যান এবং বুলেটবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দেন, সেটাও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় বিবেকবান মানুষের মাথা নত করিয়েছে। মোট মৃতের সংখ্যা ২৬ হয়েছে।

সেদিনের কাহিনি ইতিমধ্যেই সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়েছে। মর্মান্তিক সেই কাহিনি পড়লে ও অসহায় শিশুদের অবস্থা কল্পনা করলে মানুষের পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা প্রকৃতই দুরূহ।

কিন্তু কেন এই নির্বিচার শিশুহত্যা? হত্যাকারী ২০ বছরের এক যুবক, নাম অ্যাডাম ল্যানজা। এই যুবকের আচার-আচরণ, মানসিকতা নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। সহপাঠীরা অভিমত জানাচ্ছে। মনস্তত্ত্ববিদরা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। কেউ বলেছেন, অ্যাডাম অটিজম রোগের শিকার ছিল। এক সময়ের সহপাঠীরা জানিয়েছেন, পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল সে, কিন্তু সর্বদা একা একা থাকত। মনস্তাত্ত্বিকরা গবেষণা করছেন, কী ধরনের মানসিক রোগ বা বিকৃতি অ্যাডামের থাকতে পারে।

দেখা যাচ্ছে, এই ঘটনার জন্য আমেরিকার অস্ত্র আইনকে দায়ী করেও অভিমত ব্যক্ত হচ্ছে। আমেরিকার এই অস্ত্র আইন অনুযায়ী নাগরিকদের নিজস্ব অস্ত্র রাখার অধিকার আছে। কিন্তু ঘরে অস্ত্র আছে বলেই কেউ নির্বিচারে মানুষ হত্যায় মত্ত হবে, বা সেই অস্ত্রই তাকে শিশুহত্যায় প্ররোচিত করবে — এহেন কথার কোনও সারবত্তা বা যুক্তি নেই।

দ্বিতীয় যুক্তি অনিবার্যভাবেই অ্যাডামের বিকৃত মানসিকতার। মনস্তত্ত্ববিদরা ইতিমধ্যেই সেই রায় বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু কেন এই বিকৃত মানসিকতার জন্ম হল মেধাবী ছাত্র অ্যাডামের মধ্যে। স্বভাবতই

পরিবারের প্রশ্ন, পারিবারিক পরিবেশের কথা আসছে। কিন্তু আমেরিকায় অ্যাডাম তো একা নয়, স্যান্ডি হুক স্কুলের ঘটনাও প্রথম নয়। সংবাদপত্রই গত কয়েক বছরে এরকম ৮টি ঘটনার উল্লেখ করেছে। এগুলি সবই স্কুল ও কলেজের ঘটনা যেখানে ঘাতক হয় কোনও ছাত্র নাহয় কোনও যুবক। কিন্তু এ ধরনের নির্বিচার হত্যা বা বিকৃত মনের মানুষের দ্বারা মানুষ খুন আমেরিকার সমাজে অসংখ্য ঘটেছে বা ঘটছে। যেগুলি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রচারের বাইরেই থেকে যায়।

অতএব অ্যাডামের ঘটনা বা কাজ বিচ্ছিন্ন নয়। কাজেই একটি পরিবারের বিশেষ প্রতিকূল পরিবেশ বা একটি যুবকের মানসিক বিকৃতির নিদর্শন বলে এর ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছে না। এই বিকৃতির উৎস খুঁজতে হচ্ছে সমাজের মধ্যে, বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে। একটি কিশোর বা যুবকের মানসিক গঠন তৈরি হওয়ার পিছনে পরিবারের ভূমিকাকেই একমাত্র বা বড় করে দেখে, সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের ভূমিকাকে খাটো করলে, গুরুতর ভুল করা হয়।

মার্কিন সমাজে অ্যাডমরা যখন একক নয়, তখন এই বিকৃত, খুনি মন তৈরি হওয়ার উপকরণ রয়েছে মার্কিন সমাজেই। ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্র— এই দুই 'তন্ত্রের' উপরই মার্কিন সমাজ দাঁড়িয়ে আছে বলে মার্কিন শাসকরা গর্বভরে দুনিয়াকে শোনান। নতুন নতুন প্রেসিডেন্টরা এসে 'জাতির উদ্দেশে ভাষণে' মার্কিন নাগরিকদের এই ধনতন্ত্র ও

পাঁচের পাতায় দেখুন

চাষির আত্মহত্যার প্রমাণ দিতে হবে পরিবারকেই?

অভাবি বিক্রির কারণে কোনও কৃষক আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠলে, পরিবারকেই তার সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। ১ ডিসেম্বর চলতি মরসুমের ধান কেনা নিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেছেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী। মন্ত্রীর বিবৃতিটি শুনলে মনে হয়, শখ করে কেউ যে আত্মহত্যা করেন না, এ কথা হয় তাঁরা বোঝেন না অথবা বুঝেও না বোঝার ভান করেন।

কৃষককে কেন আত্মহত্যা করতে হয়? আকাশছোঁয়া দরে সার-বীজ-কীটনাশক কিনে চাষ করে, জলসেচ করে ফসল ফলিয়ে, তারপর সেই ফসলের অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য হয় কৃষক। তাতে চাষের খরচ ওঠে না, আরও ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তারা। অনাহার-অর্ধাহার, তার উপর পরিবার-প্রতিপালনের চিন্তা তাদের আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়। এদের মর্মান্তিক পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টাই করেন না সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা। ঋণগ্রস্ত চাষিকে তার চরম দুরবস্থা থেকে বের করে নিয়ে আসার দায়িত্ব তো তাঁদেরই। সেই আশা নিয়েই তো মানুষ তাঁদের ভোটে জেতান। সে দায়িত্ব পালন করা দূরে থাক, এখন আত্মঘাতী কৃষক পরিবারকেই আত্মহত্যার প্রমাণ দিতে বলা হচ্ছে। যথাযথ দায়িত্ব পালন না করে যে অপরাধ নেতা-মন্ত্রীরা করে চলেছেন, তার দায় আত্মঘাতী চাষির পরিবারের ওপর চাপানোর চেষ্টা চলছে। যখন দরকার ছিল শোকাহত পরিবারের সদস্যদের খোঁজখবর করা বা তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, তা না করে খাদ্যমন্ত্রীর এই উদ্ধত উক্তি— কৃষকদের ক্ষোভে অগ্নিনিক্ষেপ করেছে। অভাবি কৃষক পরিবারের শোকাতুর সদস্যরাও মন্ত্রীর বক্তব্যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

কৃষক স্বার্থের কথা বলে যারা ক্ষমতায় আসীন হলেন, কৃষকদের প্রতি সেই সরকারের এমন দৃষ্টিভঙ্গি কেন, কেনই বা খাদ্যমন্ত্রীর এত গোঁসা? মুখ্যমন্ত্রীও স্বয়ং গত মরসুমে ফসল ওঠার পর কৃষক আত্মহত্যার ঘটনাকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' ঘটনা বলে অভিহিত করে দায়িত্ব স্খালনের চেষ্টা চালিয়েছেন। কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করলেও সিপিএম সরকারের মতো প্রচার চালিয়েছেন, এ সব বিরোধীদের অপপ্রচার। একের পর এক অভাবি কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, একজন কৃষকও ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করেনি।

এদিকে কৃষকদের আত্মহত্যার খবরকে ইস্যু করে বর্তমানে বিরোধী সিপিএম ফায়দা তোলার ব্যাপক চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু মানুষ ভুলে যায়নি যে, তাদের আমলেও কৃষক আত্মহত্যার মিছিল দেখা গেছে। একইভাবে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে আসার পরও দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনও দিশা পাচ্ছে না বেঁচে থাকার। সিপিএমও যেমন নিজেদের দোষ ঢাকতে বলত— অনাহারে-অভাবে কৃষক আত্মহত্যা করেনি, পরিবারের অশান্তিতে করেছে, তেমনই তৃণমূলও তাদের দোষ অস্বীকার করছে জোর গলায়। এতটুকু লজ্জাবোধ নেই তাদের। পরস্পর বিরোধী দুটি দল একে অপরের দিকে যতই আঙুল তুলে অভিযোগ করুক না কেন, উভয় দলই যে দায়ী— এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই কৃষক আত্মহত্যার কারণ প্রকাশ্যে এলে তাদের 'নিষ্কলঙ্ক' রাজ্যপাটে কালো দাগ লেগে যেতে পারে এই আশঙ্কায় মন্ত্রীমশায়ের বেজায় রাগ। আর সে জন্যই পরিবারকেই চাষির আত্মহত্যা প্রমাণ করার ফরমান।

কোনও চাষি যাতে আত্মহত্যা করতে বাধ্য না হন, তার জন্য মন্ত্রী কী উদ্যোগ নিয়েছেন? তিনি কি চাষিদের ফসল ন্যায্য দামে বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন? ভালো বীজ কম দামে চাষিদের দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন? আকাশছোঁয়া সারের দামে কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রণ এনেছেন? কালোবাজারি ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন? না, কোনওটাই তাঁরা করেননি। শুধুমাত্র ঘোষণা করেছেন, 'চাষিদের নির্ধারিত মূল্যের কম দামে ধান অভাবি বিক্রি করতে দেবে না রাজ্য সরকার। তা করতে প্ররোচিত করলেই কড়া ব্যবস্থা নেবে সরকার।' ভালো কথা। ঘোষণা করলেই শুধু হল? তা কার্যকর করার দায়িত্বও তো নিতে হবে সরকারকে। নাহলে শুধু দু-এক জায়গায় ধান কিনে সংবাদমাধ্যমে তার প্রচারের দ্বারাই চাষিদের অভাবি বিক্রি বন্ধ হবে না। চাষি পরিবারের হাহাকারও বন্ধ হবে না।

এই অবস্থায় চাষিদের ক্ষতের উপশম না করে যন্ত্রণা আরও বাড়াবার জন্য খাদ্যমন্ত্রীর সদম্ভ উক্তি এবং সমবেদনার পরিবর্তে আত্মহত্যাকারী কৃষক পরিবারের প্রতি নির্দয় ফরমান আমজনতা ভালো চোখে দেখছে না। মন্ত্রী মশায়ের কাছে আবেদন, কৃষকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কিছু অন্তত কার্যকর করুন।

ওড়িশা রাজ্য শ্রমিক সম্মেলন

ওড়িশা সরকারের শিল্পনীতি জনগণের প্রতি এক বিরাট প্রতারণা। প্রাকৃতিক সম্পদ, খনি, উর্বর জমি, বনাঞ্চল, জলসম্পদ সবই বেসরকারি পুঁজিগোষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে দালালের ভূমিকা পালন করছে সরকার। অনগুল জেলা এমনই শিল্পায়নের ভয়াবহ শিকার। ২ ডিসেম্বর অনগুল স্টেডিয়ামে শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র চতুর্থ ওড়িশা রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে একথা বলেন আমন্ত্রিত অতিথি এস ইউ সি আই (সি) ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড ধূর্জটি দাস।

পাঁচ সহস্রাধিক শ্রমিক সমাবেশে প্রধান বক্তা, সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা বলেন, শ্রমিকদের দুর্দশার জন্য দায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আর্থিক নীতি। তিনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কমরেড শম্ভুনাথ নায়ককে সভাপতি, কমরেড জয়সেন মেহেরকে সম্পাদক এবং পূর্ণ বেহেরাকে অফিস সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করে ৩৬ সদস্যের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

মধ্যপ্রদেশের জবলপুর জেলার অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রথম জেলা সভানেত্রী, দলের আবেদনকারী সদস্য কমরেড নীলিমা রায় ৮০ বছর বয়সে ২৮ সেপ্টেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পেশায় স্কুল শিক্ষিকা ১৯৮০-র দশকে মহান চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করে নারী সমাজের মধ্যে এই আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারে ব্রতী ছিলেন। ১৯৯১ সালে জবলপুর লোকসভা কেন্দ্রে তিনি এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

৯ ডিসেম্বর প্রয়াত কমরেড রায়ের স্মরণে স্থানীয় ডি বি ক্লাবে ভাবগম্ভীর পরিবেশে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড ইউ পি বিশ্বাস।

কমরেড নীলিমা রায় লাল সেলাম

আসাম রাজ্য শ্রমিক সম্মেলন

১ ডিসেম্বর মঙ্গলদৈ-এ সংগঠনের আসাম রাজ্য সম্মেলনে প্রকাশ্য সমাবেশের উদ্দেশে মিছিল।

ডায়মন্ডহারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটি বিল প্রসঙ্গে বিধানসভায় অধ্যাপক তরুণ নস্কর

রাজ্য সরকার ডায়মন্ডহারবারে যে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা করেছে, তাকে সমর্থন জানিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে মহীয়সী বেগম রোকেয়ার নামাঙ্কিত করার প্রস্তাব দেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর। ১০ ডিসেম্বর রাজ্য সরকার বিধানসভায় 'ডায়মন্ডহারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটি বিল' পেশ করে। বিলের উপর বিতর্কে অংশ নিয়ে কমরেড তরুণ নস্কর বলেন, 'গতকাল ৯ ডিসেম্বর ছিল রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যুর দিন। ১৮৮০ সালে তাঁর জন্ম। একটি গোঁড়া মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সেই যুগে তিনি যে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, শিক্ষা বিস্তারের যে মহান প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন, তাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি তাঁর নামাঙ্কিত করতে পারি, তবে আমরা নিজেদের প্রতিও সম্মান জানাব।' প্রস্তাবটি গ্রহণ করার জন্য তিনি মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

বিগত সিপিএম পরিচালিত সরকার শেষের দিকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। যেমন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও সিধু-কানহু বিশ্ববিদ্যালয়। এর কোনওটিতেই তারা প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলেনি। কোথাও বা ক্লাসঘরের অভাব, ল্যাবরেটরি নেই, কোথাও বা শিক্ষক নেই, কোথাও কলেজের কয়েকটি ঘর নিয়েই তড়িঘড়ি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে দেওয়া হয়েছিল। অধ্যাপক নস্কর বলেন, 'আসলে ভোটের বাজারে তাঁদের প্রয়োজন ছিল লোককে দেখানো যে, এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরা স্থাপন করেছেন।'

বিধায়ক বলেন, 'বর্তমান সরকারও কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহারে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছেন এবং এখন এই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করছেন। এদের যদি পরিকাঠামো অপ্রতুল হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের ১২বি ধারায় স্বীকৃতি পাবে না। তা হলে মঞ্জুরি কমিশনের অনুদান পাবে না, এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা অন্য রাজ্যে অসুবিধায় পড়তে পারে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর প্রতি নজর দেওয়ার জন্য তিনি মন্ত্রীকে অনুরোধ জানান।

বিলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যে মনোনীত কাউন্সিল তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তার সমালোচনা করে তিনি প্রস্তাব দেন, এই মনোনীত কাউন্সিলের সময়কাল যাতে দ্রুত শেষ করে নির্বাচিত কাউন্সিল গঠন করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন কাউন্সিলের স্বাধিকারের যে দাবি কংগ্রেস ও সিপিএম করেছে, অধ্যাপক নস্কর তারও সমালোচনা করেন। বলেন, স্বাধিকারের কথা বলা এই দলগুলির শোভা পায় না। বলেন, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার বার বার শিক্ষার স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। গোটা দেশের উচ্চশিক্ষাকে ৭ জন মনোনীত ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাবও এনেছিল কংগ্রেস সরকার। আর, সিপিএম সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোনীত সদস্যদের দিয়ে যে পরিচালন কাউন্সিল তৈরি করেছিল, তা এখনও চলছে। এগুলি একেবারেই অভিপ্রেত নয়।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের মৃত্যুঘন্টা বাজবে না তো!

রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় বসার কিছুকাল পরেই ঘোষণা করেছে, রাজ্যের অধিগৃহীত রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাগুলি থেকে ভর্তুকি তুলে দেওয়া হবে। সংস্থাগুলিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এই ঘোষণার পর সংবাদমাধ্যমগুলি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখাতে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পরিবহনগুলিতে আয়ের থেকে ব্যয় কতগুণ বেশি। একটা প্রচার তোলা হয়, ভরতুকি দিয়ে এসব সংস্থা চালানো মানে রাজকোষের অপচয়। ফলে সংস্থাগুলিকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর নামে শুরু হয় কর্মী ছাঁটাই, স্বেচ্ছা বা বাধ্যতামূলক অবসর। কর্মীদের বেতন হয়ে পড়েছে অনিয়মিত, অন্যান্য আর্থিক পাওনাগুলি কবে মিটবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পরিবহন কর্মীদের পরিবারগুলিতে কার্যত হাহাকার অবস্থা। পরিস্থিতির চাপে ইতিমধ্যেই কয়েকজন শ্রমিক আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হয়েছেন।

ভরতুকি তুলে দেওয়ার প্রচারকরা একটা কথা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তা হল, পরিবহন ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল জনস্বার্থে। তা লাভের জন্য তৈরি হয়নি। শুরু থেকেই পরিবহন ব্যবস্থাকে 'পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস' হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এখনও প্রতি ছয় মাস অন্তর রাজ্যপাল কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সংস্থাগুলি সৃষ্টির সময় থেকে না-লাভ না-লোকসান — এই ভিত্তিতেই দেখা হত। নিয়ম ছিল, এতে যদি না চলে তবে সরকার ভরতুকির মাধ্যমে তা পুষিয়ে দেবে। কারণ এগুলি জনকল্যাণমূলক পরিষেবা। কোচবিহারের মহারাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর ১৯৪৫ সালে যখন কোচবিহার স্টেট ট্রান্সপোর্ট স্থাপন করেন তখন জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখেই রাজকোষ থেকে ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

১৯৫০ সালে কোচবিহার রাজ্য ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তির পর কোচবিহার স্টেট ট্রান্সপোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে আসে এবং পরে তা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন এই সংস্থাটির আয়-ব্যয়ের একটা স্থিতিশীলতা ছিল। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে তা মেটানো হত সরকারি অনুদানের মাধ্যমে (ওয়েজ অ্যান্ড মিনস), যা পরবর্তী সময়ে ভরতুকি (সাবসিডি) হিসাবে গণ্য হয়।

সংস্থা সৃষ্টির সময় মূলধন জোগাত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে। সে অনুপাত হল ১ঃ২। কেন্দ্রীয় সরকার মূলধন (ক্যাপিটাল কন্ট্রিবিউশন) বরাদ্দ করত নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে মারফত। পরবর্তীকালে তা কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতল পরিবহনের (সারফেস ট্রান্সপোর্ট) মাধ্যমে বরাদ্দ হত। কেন্দ্রীয় সরকার যা বরাদ্দ করত তার দ্বিগুণ অর্থ বরাদ্দ করত রাজ্য সরকার। কিন্তু ১৯৮৪ সালের পর ক্যাপিটাল কনট্রিবিউশনের কোনও অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেনি। দুটি শর্তের ভিত্তিতে সরকারি কনট্রিবিউশন বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। একটি হল, সংস্থাকে লাভজনক হতে হবে, অপরটি হল লোকসান ২০ শতাংশ কমিয়ে আনতে হবে। এই দু'টি শর্ত পূরিত না হওয়ায় ক্যাপিটাল কনট্রিবিউশন বন্ধ হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার আর্থিক সংকটের জন্য সরকারের এই ভূমিকা অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয় কারণটি হল সরকারের বেসরকারিকরণ নীতি। এই বেসরকারিকরণ ১৯৭২ সালে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কংগ্রেস সরকারের মাধ্যমে শুরু হয়। পরবর্তীতে বামফ্রন্টও তাই করে যায়। যে সমস্ত রুটগুলিতে বেশি যাত্রী চলাচল করত, যেগুলি ছিল লাভজনক, সেগুলি এই দুই সরকারের মাধ্যমে বেসরকারি হাতে চলে যায়। পরিবহন ব্যবসা এমনই লাভজনক যে, বেসরকারি মালিকরা একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে বাস করে নিচ্ছে। তাদের ব্যবসা এবং বিপুল মুনাফার স্বার্থে সরকার পরিকল্পিতভাবে লাভজনক রুট ছেড়ে দেওয়ায় সরকারি পরিবহন ব্যবস্থা আর্থিক সংকটে পড়ে যায়।

সংকটের তৃতীয় কারণটি হল স্বজন-পোষণ ও দলবাজি। সিপিএম শাসনে দলের নেতাদের স্বজন ও অনুগতদের ঢালাওভাবে ঢোকানো হয়েছে পরিবহনে, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিচার করা হয়নি। এর ফলে দলীয় কর্মী ইউনিয়নের দাদাগিরি বেড়েছে। কর্মসংস্কৃতি নেমেছে।

এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসে ব্যয়সংকোচের নামে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের আটটি ডিপো ও একটি স্টেশন বন্ধ করে দেয়। ধাপে ধাপে শ্রমিক ছাঁটাই শুরু করে। ফল দাঁড়াল উল্টো। ছাঁটাই ও প্রতিমাসে প্রচুর কর্মীর অবসরের ফলে কর্মী সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। কর্মীর অভাবে রাস্তায় গাড়ি চালানো মুশকিল হয়ে পড়ে। ফলে সংস্থার মোটর গাড়ির সংখ্যা যেখানে ৭০৬টি, সেখানে রাস্তায় চলে মাত্র ৪১০টি। তাছাড়া কর্মী সংখ্যার অভাবে বাসগুলির রক্ষণাবেক্ষণেও সমস্যা হচ্ছে। প্রাইভেট গ্যারেজে বাস সারাই করতে হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, ব্যয় সংকোচের নামে শ্রমিক ছাঁটাই কি সত্যিই প্রয়োজনীয় ছিল?

এই সংস্থার আর্থিক সংকট নিরসন করতে হলে সমস্ত রুটে নির্দিষ্ট সময়ে সরকারি বাস চালাতে হবে, সেখানে কোনও প্রাইভেট বাসের পারমিট দেওয়া যাবে না। সংস্থার পুরনো বাসগুলিকে দ্রুত মেরামত করে চালু করতে হবে। যন্ত্রাংশের ও জ্বালানির দামবৃদ্ধির সাপেক্ষে সরকারি ভর্তুকি বাড়াতে হবে। জনগণের টাকায় জনগণকে ভরতুকি দেওয়া অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। ফলে ভরতুকি রদ করার নীতি বাতিল করতে হবে। না-লাভ না-লোকসান নীতির ভিত্তিতে পরিবহন চালাতে হবে। এছাড়া সংস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তিবিদদের মতামত বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিতে হবে। দলবাজি, চুরি, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ বন্ধ করে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে হবে।

উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রত্যাশা ছিল, রাজ্যে পালাবদলের পর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটবে এবং তার হৃত গৌরব ফিরে আসবে। কিন্তু রাজ্যের তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় বসার ১৮ মাস পরেও কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারেনি। বামফ্রন্ট আমলে যেমন কোনও সুষ্ঠু পরিবহন নীতি ছিল না, এ আমলেও তা লক্ষ করা যাচ্ছেনা। তৃণমূল সরকার এই সংস্থার উন্নতির জন্য যে ভাবছে রাজ্যের বাজেটে তার কোনও প্রতিফলন নেই। সিপিএম আমলের মতই গয়ংগচ্ছ মনোভাব এবং দলবাজির পথই অবলম্বন করে চলেছে তৃণমূল সরকার। ফলে সংশয় দৃঢ়মূল হচ্ছে, তৃণমূল সরকারের হাত ধরে সংস্থার মৃত্যুঘন্টা বাজবে না তো?

চাষিরা রাস্তার জন্য জমি দিতে পারে, রাস্তা নিয়ে ব্যবসার জন্য নয়

'জমি জটে' আটকে যাচ্ছে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ — এই জাতীয় কিছু সংবাদ সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে অনেকেই লক্ষ করেছেন। যেন যারা জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে তারা রাস্তা সম্প্রসারণের সামনে প্রধান বাধা, অথচ জনস্বার্থে এই রাস্তা সম্প্রসারণ খুবই জরুরি। এইভাবে কৌশলী প্রচার তুলে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য উচ্ছেদের মুখে পড়া হাজার হাজার চাষি, খেতমজুর, ব্যবসায়ীসহ নানা পেশার মানুষকে 'উন্নয়নবিরোধী' 'জনস্বার্থ-বিরোধী' হিসাবে দেখানোর চেষ্টা চলছে, যাতে এই আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়া যায়।

উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা থেকে উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত পর্যন্ত ৩৪নং জাতীয় সড়কের দীর্ঘ ৪৩৩ কিমি রাস্তা চওড়া করার জন্য অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে গত কয়েক বছর ধরে আন্দোলন করছে কৃষিজমি-বাস্তু ও জীবনজীবিকা রক্ষা কমিটি। আধুনিক সভ্যতার প্রয়োজনে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারিত হওয়া দরকার — এ নিয়ে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু আজ তো দেশের জাতীয় সড়ক দেশি-বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার লাভজনক ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়নের নামে দেশের অন্যান্য সম্পত্তির মতো রাস্তার বেসরকারিকরণ এবং জমি ও শ্রম লুঠ চলছে। রাস্তা আজ এমন লাভজনক পণ্য যে, তাতে বিনিয়োগ করতে দুনিয়ার বহু বৃহৎ কোম্পানি ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভারত সরকারও উন্নয়নের ধুয়ো তুলে রাস্তায় বৃহৎ পুঁজির বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে। দেশের মানুষের যাতায়াতের সুব্যবস্থার জন্য রাস্তা তৈরির দায়িত্ব থেকে সরকার হাত তুলে নিয়েছে। বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানিগুলির রাস্তায় বিনিয়োগের উৎসাহের কারণ রাস্তায় যাতায়াতকারী যানবাহন থেকে বিপুল পরিমাণ টোল বাবদ প্রচুর মুনাফা কামানো। এছাড়াও সৌন্দর্যায়ন, পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদির নামে, এমনকী রাস্তার পাশে গাছ লাগানোর নাম করে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নানা কোম্পানি তুলবে। তার থেকেও আসবে মুনাফা। দখলের এলাকা যত বাড়বে ততই বাড়বে মুনাফা। রাস্তার দু-পাশের কৃষিজমি দখল করে, বাস-ট্রাক টার্মিনাস, প্লাজা ইত্যাদি মুনাফার আর একটি অস্ত্র। বহুজাতিকরা মুনাফা করবে। কিন্তু জমি দিতে হবে সাধারণ মানুষকে। গত ৬০ বছরে রাস্তার দুপাশে দু'বার রাস্তা চওড়া করার নামে যে জমি অতিরিক্ত অধিগৃহীত হয়েছে, আজ সেই রাস্তাকে বহু জায়গায় বাইপাস করে গতি পরিবর্তন করা হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন এলাকার উপর দিয়ে। এই নতুন নক্সার সঙ্গে জনস্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। এই নয়া নীল নক্সাকে কার্যকর করতে হাইওয়ে অথরিটি সাধারণ মানুষের বসতবাড়ি, স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, ধ্বংস করতে এবং কয়েক লক্ষ একর তিনফসলি কৃষিজমি নষ্ট করতেও পিছপা হচ্ছে না। দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে সাধারণ মানুষ গুণাগার দেবে কেন? রাস্তার জন্য জমি নেওয়া, আর রাস্তার নামে জমি নিয়ে ব্যবসা করা এক জিনিস নয়।

দু' লেনের রাস্তার জন্য ২২ ফুট জায়গা লাগে। রাস্তাকে চার লেনের করলে তার দ্বিগুণ ৪৪ ফুট জমি দরকার হতে পারে। মাঝে প্যাসেজ ও দুপাশে যদি আরও দুটি রাস্তা (ফুটপাথ বা নতুন রাস্তা) হয় তাহলেও ৮০ ফুট জায়গায় ছয় লেন সম্ভব। আরও ১০ ফুট বাড়িয়ে ধরলে ৯০ ফুট। কিন্তু কোম্পানি ও মালিকরা চাইছে ২০০ থেকে ২৫০ ফুট। এই বাড়তি জায়গা ব্যবসার জন্য ছাড়া আর কোন কাজে লাগতে পারে? এর নাম কি জাতীয় স্বার্থ? ইতিপূর্বে দু'বার এই রাস্তা সম্প্রসারিত হয়েছে। দুপাশের মানুষ বহু ক্ষতি স্বীকার করে জমি দিয়েছে, কিন্তু কোনও ক্ষতিপূরণ পায়নি। আজও বহু এলাকায় পুরনো অধিগৃহীত জমি ফেলে রেখে অন্যদিক দিয়ে টানা দীর্ঘ এলাকা নতুন করে দখল নেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। অথচ রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য প্রতিটি জেলায় রাস্তার দু'পাশে পূর্বের অধিগৃহীত যথেষ্ট জায়গা খালি পড়ে আছে।

এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন আইন ২০০৭-এ স্পষ্ট উল্লেখ আছে— সরকারি প্রকল্পগুলি যতটা সম্ভব কম ক্ষতি করে, ন্যূনতম কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে রূপায়ণ করতে হবে। শুধু তাই নয়, 'জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এবং পুনর্স্থাপন' বিল নামে নতুন যে বিল গত বাদল অধিবেশনে সংসদে তৎকালীন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ পেশ করেছিলেন, সেখানে সংসদীয় কমিটির মন্তব্য ছিল, দেশে যত জমি অধিগ্রহণ করা হয় তার ৯৫ শতাংশই হয় জাতীয় সড়ক ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য। তাই জমি অধিগ্রহণে সতর্ক থাকা দরকার, কোনওভাবেই যাতে চাষির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ, বিকল্প কর্মসংস্থান, ভাগচাষি, খেতমজুর, দোকানদারদের ক্ষতিপূরণ সবই খতিয়ে দেখা দরকার। বহুজাতিকদের স্বার্থে, কৃষকদের পথে বসিয়ে গায়ের জোরে জমি দখলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেশে তুলে ধরেছে পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের আন্দোলন। তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারকেও কৃষকের এবং সাধারণ জমি ব্যবহারকারীদের কথা অন্তত মুখে বলতে হচ্ছে। ডালখোলা থেকে বারাসত ৩৪নং জাতীয় সড়কের দীর্ঘ ৪৩৩ কিমি রাস্তার মধ্যে কোথাওই শহর বা বাজার রক্ষার জন্য ফ্লাইওভারের কোনও পরিকল্পনা ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির নক্সায় নেই। সর্বত্রই বাইপাস হবে কৃষিজমি নিয়ে। সরকার কৃষকের স্বার্থ সত্যই ভাবলে কী করে এই নক্সায় সম্মতি দিতে পারল? কৃষিজমি-বাস্তু ও জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটি বারবার হাইওয়ে অথরিটি, পূর্তদপ্তর, জেলা প্রশাসন — সর্বত্র নক্সা পরিবর্তন ও জনসাধারণের সম্পত্তি সুরক্ষার দাবি জানিয়ে, আসছে। কিন্তু সরকার এই দাবির প্রতি গুরুত্বই দেয়নি। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার স্বার্থকে বাদ দিয়ে জাতীয় স্বার্থের কথা ভাবা যায় কী করে? হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ ও সরকারের উচিত এই বিভ্রান্তিকর প্রচার বন্ধ করে, অপ্রয়োজনীয় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ করে নক্সা সংশোধন করে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত সমাধা করা।

হিগস বোসন কণা আবিষ্কারের তাৎপর্য

(২)

এর পরের ধাপে বিজ্ঞানীরা এইসব ধারণাকে আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন। যেমন, দেখা গিয়েছিল ইলেকট্রনের উল্টো চার্জবিশিষ্ট কণা পজিট্রন আছে। তাঁরা যুক্তি করলেন সব কণারই উল্টো চার্জবিশিষ্ট কণা থাকা সম্ভব, তারাও নিশ্চয়ই আছে। খুঁজে দেখা গেল অনুমানটা সঠিক। প্রোটনের উল্টোকণা অ্যান্টি প্রোটন আছে, মিউঅনের উল্টো অ্যান্টি মিউঅন আছে ইত্যাদি (পাঠক এটাকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ইউনিটি অব অপোজিট-এর ধারণার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না, কারণ কোনও কণা আর তার উল্টো কণা কখনওই একত্রে থাকে না। সংস্পর্শে এলে দুটোই বিলীন হয়ে যায় আর তৈরি হয় শক্তি)।

আগেই বলেছি, ইলেকট্রনের সাথী এক নিউট্রিনোকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। এবার বিজ্ঞানীরা যুক্তি করলেন, এই গোত্রের অন্য যে সব লেপ্টন কণা আছে, যেমন পজিট্রন, মিউঅন, অ্যান্টি মিউঅন, টাওঅন প্রভৃতি তাদেরও সাথী নিউট্রিনো আছে। এই সব নিউট্রিনোদেরও খুঁজে পাওয়া গেল।

বিজ্ঞানীরা যুক্তি করলেন, তড়িচ্চুম্বকীয় বলের বাহক যেমন ফোটন কণা তেমনি অন্যান্য বলেরও বাহক কণা থাকতে হবে। দেখা গেল দৃঢ় বলের বাহক কণা গ্লুঅন। আর মৃদু বলের বাহক কণা তিন রকম, W^+, W^-, ও Z। মাধ্যাকর্ষণের বাহক কণা এখনও পাওয়া যায়নি, তাই তাকে এখন আলোচনার বাইরে রাখতে হচ্ছে।

এই যে এত সব বলের বাহক কণা, তাদের কি কোনও সাধারণ ধর্ম আছে? এই ধর্মের হদিশ পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গবেষণা থেকে। তাঁর আবিষ্কৃত নিয়ম এই কণাগুলি মেনে চলে তাই তাদের সাধারণ নাম হল বোসন। অর্থাৎ ফোটন কণাও এক ধরনের বোসন, W^+, W^-, Z ও গ্লুঅন — এরাও তাই।

যখন কণাদের জগতটা আমরা বুঝে ফেলেছি বলেই মনে হচ্ছিল, তখন পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান একটা নতুন সমস্যা সামনে এনে দিল। পঞ্চাশ ষাটের দশকে ত্বরকযন্ত্র (অ্যাকসিলারেটার) তৈরি হয়ে গিয়েছে। তার সাহায্যে বিভিন্ন কণাকে উচ্চ গতিবেগে নিয়ে গিয়ে অন্য কণার সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ানো ও তার ফলে উদ্ভূত কণাদের বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। কিছু নতুন কণা মহাজাগতিক রশ্মি থেকে পাওয়া গেলেও এতক্ষণ যে সব কণার কথা বললাম সেগুলিও আবিষ্কৃত হয়েছে ত্বরকযন্ত্রেই। যেসব কণাদের বিজ্ঞানীরা খুঁজছিলেন, তারা তো আবিষ্কৃত হলই, কিন্তু আরও এমন অজস্র কণা আবিষ্কৃত হল যাদের অস্তিত্বের কথা তত্ত্বগতভাবে ভাবাই যায়নি। ষাটের দশকের শুরুতে বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করেন, এ যেন কণার চিড়িয়াখানা। কেউ কেউ বললেন, এতরকম কণা মৌলিক কণা হতে পারে না। এতদিন যাদের মৌলিক কণা বলে মনে করা হত, তারাও নিশ্চয় আরও ছোট কণার সমাহার। এই ভিতরের গল্পটা বুঝলেই চিত্রটা সহজ হয়ে যাবে। পাঠক নিশ্চয় এতক্ষণে ডাল্টনের যুক্তিধারার ধারাবাহিকতাটা বুঝতে পারছেন।

কাজটা শুরু করেন ১৯৬১ সালে মারে গেলমান আর জর্জ জ্বোয়াইগ। তাঁরা বললেন প্রোটন নিউট্রন, যাদের আমরা এতদিন মৌলিক কণা মনে করতাম, তারাও আরও ছোট কণা কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি। কোয়ার্ক নামটা তাঁরা নিলেন জেমস জয়েসের উপন্যাসের ভাষা থেকে। এদের মধ্যে দু'ধরনের কোয়ার্ক আছে, আপ আর ডাউন। প্রোটনের চার্জ যদি q হয় তবে আপ কোয়ার্কের চার্জ $\frac{2}{3}q$ আর ডাউন কোয়ার্কের চার্জ $-\frac{1}{3}q$। অর্থাৎ দুটো আপ ও একটা ডাউন কোয়ার্ক থাকলে চার্জ হবে $(+\frac{2}{3}-\frac{1}{3})q = q$। এটাকেই আমরা প্রোটন বলে জানি। আবার দুটো ডাউন ও একটা আপ কোয়ার্ক থাকলে চার্জ হবে $(-\frac{1}{3}-)q = 0$। এটাই নিউট্রন।

যত কণা আবিষ্কৃত হয়েছিল তাদের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গেল, মাত্র দুটি কোয়ার্ক দিয়ে চলবে না, ছয় ধরনের কোয়ার্ক থাকতে হবে। এক অক্ষরে এদের প্রকাশ করা হয়, u, d, s, c, t এবং b দিয়ে। পুরো নাম আপ, ডাউন, স্ট্রেঞ্জ, চার্ম, টপ ও বটম। এটা করা হয়েছে পার্থক্য বোঝাবার জন্য। এর সাথে উপর, নিচ, অপরিচিতি, বা মজার কোনও সম্পর্ক নেই। এরা থাকলে এদের উল্টো কণাও থাকবে। সবমিলে হবে ১২ রকম কোয়ার্ক। এর সবকটির অস্তিত্বই বর্তমানে প্রমাণিত।

এই পরিস্থিতিতে তত্ত্বের দিক থেকে বড় রকম অগ্রগতি ঘটালেন ইয়াং ও মিলস্। জানা ছিল যে, পদার্থবিদ্যায় প্রতিসাম্যের ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে যেখানেই কোনও সংরক্ষণ সূত্র কাজ করে, সেখানেই দেখা গিয়েছে, তার পেছনে কাজ করছে কোনও একরকম প্রতিসাম্য। এখানে প্রতিসাম্য (সিমেট্রি) কথাটা একটু গভীর অর্থে ব্যবহার করা হয়। তাই একটু ভেঙে বলা দরকার। কোনও কোনও ফুল বা কোনও কেলাসের প্রতিসাম্য দেখে আমাদের তাক লাগে। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি ফুলটির প্রতিসাম্যের সংজ্ঞা কী হতে পারে? বিষয়টা একটা বর্গক্ষেত্রের উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যাক। বর্গক্ষেত্রটির প্রতিসাম্যের ভিতরের ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা হল, আপনি যখন দেখছেন না তখন কেউ যদি বর্গক্ষেত্রটি নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিয়ে যায় তা হলে আপনি বুঝতেও পারবেন না। অর্থাৎ, কোনও একটি বস্তুকে প্রতিসম বলব তখনই যদি তার ওপর কোনও ক্রিয়া করা হয় (যেমন তার কেন্দ্রের চারদিকে ঘোরানো) এবং তা সত্ত্বেও তা অপরিবর্তিত থাকে। এই অর্থে একটি বৃত্ত বর্গক্ষেত্রের চেয়ে বেশি প্রতিসম, কারণ তাকে যে কোনও কোণে ঘুরিয়ে দিলেও আপনি বুঝতে পারবেন না।

ইয়াং এবং মিলস দেখালেন, সূক্ষ্ম কণাদের জগতে একধরনের প্রতিসাম্য কাজ করে। এর নাম হল গেজ প্রতিসাম্য। এই প্রতিসাম্যের নিরিখে তখন সব কিছু বোঝার প্রচেষ্টা শুরু হল। দেখা গেল, সব অঙ্ক সুন্দরভাবে মিলে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা একমত হলেন, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের এক নতুন রূপ ধরা পড়েছে।

কিন্তু দেখা গেল হিন্দিতে যাকে বলে 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়'। যদি সব বলের ধারক বোসন কণা এই প্রতিসাম্য মেনে চলে তবে তত্ত্ব অনুযায়ী তাদের হতে হবে ভরহীন। আগেই জানা ছিল, ফোটন কণার স্থিরভর শূন্য। গ্লুয়ন কণারও স্থিরভর শূন্য। কিন্তু দেখা গেল W-বোসন ও Z-বোসনের ভর আছে। তবে কি গেজ প্রতিসাম্য এখানে কাজ করে না?

১৯৬৪ সালে পিটার হিগস এবং অন্য কিছু বিজ্ঞানী বললেন, না। এত সুন্দর তত্ত্বকাঠামোকে ভুল বলে মানতে মন চাইছে না। এমনও তো হতে পারে প্রতিসাম্যের ধারণাটি ঠিক, তাই সব বোসনই আদতে ভরহীন। কিন্তু বলের ক্রিয়ামাধ্যম হিসাবে যে চার ধরনের ক্ষেত্রের কথা আমরা জানি তার বাইরেও আর একরকমের এখনও-না-জানা ক্ষেত্র আছে। আর তার প্রভাবেই W এবং Z-বোসন ভর প্রাপ্ত হচ্ছে। কোনও বস্তুর ভর আছে মানে হচ্ছে, তার ওপর বলপ্রয়োগ করা হলে সে অবস্থার পরিবর্তনকে বাধা দিতে চাইবে। মানে তার জাড্য আছে। একটা ত্বরণ তৈরি হবে। এবং তার প্রভাবে তার গতিবেগ ধীরে ধীরে বাড়বে (ভর = বল/ত্বরণ)। হিগসের যুক্তি ছিল 'অবস্থার পরিবর্তনে বাধা দেওয়ার' ধর্মটা আসছে এই নতুন ক্ষেত্রের প্রভাবে। যেমন ক্যারাম বোর্ডে চটচটে কিছু লেগে থাকলে ঘুঁটি নড়তে চায় না, অনেকটা তেমনই। বিজ্ঞানীরা এই অনুমান অর্থাৎ নতুন ক্ষেত্রটির নাম দিলেন, হিগস ফিল্ড। আর আমরা জানি সব ক্ষেত্রেরই বাহক বোসন কণা থাকে। হিগস ফিল্ডের বাহক কণার নাম হল হিগস বোসন।

ষাটের দশকে আরও একটি বড় তাত্ত্বিক অগ্রগতি ঘটে। আইনস্টাইনের স্বপ্ন ছিল চার রকম বল যে একটাই বলের ভিন্ন ভিন্ন রূপ তা দেখানো। তাঁর জীবদ্দশায় এ প্রচেষ্টায় তিনি সফল হননি। তাঁর মৃত্যুর পর অন্য বিজ্ঞানীরা প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে স্টিফেন ওয়াইনবার্গ ও আবদুস সালাম প্রথম সফল হলেন তড়িচ্চুম্বকীয় বল ও মৃদু বলের সংযোগ ঘটাতে। দুটো জুড়ে নামকরণ হল ইলেক্ট্রোউইক ফোর্স। বাস্তবে তাঁদের তত্ত্বেই বোঝা গিয়েছিল মৃদু বলের বাহক হবে তিন রকমের কণা, যার কথা আমরা আগেই বলেছি। হিগস কণার ধারণাকে ব্যবহার করেই তাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের তত্ত্ব। এই সব তাত্ত্বিক এবং পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ষাটের দশকের শেষে সূক্ষ্ম কণাদের জগতের চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে এল।

সমস্ত কিছু কী কী দিয়ে গড়া? প্রশ্নটার উত্তর দাঁড়াল, ছয় রকম কোয়ার্ক এবং তাদের উল্টো কণা,

কোয়ার্ক ঃ	u	c	t	
	d	s	b	g
লেপ্টন ঃ	ν_e	ν_μ	ν_τ	z
	e	μ	τ	$W^\pm$
	ফের্মিঅন			H
				বোসন

তিন রকম লেপ্টন ও তাদের উল্টো কণা, আর তাদের ছয় রকম নিউট্রিনো, চার রকম বোসন, আর হিগস বোসন। সারণীতে সাজালে দেখায় পর্যায় সারণীর মতোই।

সারণীর বাঁ দিকের ঘরগুলোতে আছে এমন সব কণা যারা এনরিকো ফের্মির উদ্ভাবিত সংখ্যাতত্ত্ব মেনে চলে, নাম ফের্মিঅন। ডান দিকে আছে যারা তারা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উদ্ভাবিত সংখ্যাতত্ত্ব মেনে চলে, নাম বোসন। ফের্মিঅনদের মধ্যে আবার দুটো জাত। একটি কোয়ার্ক— আপ, ডাউন, চার্ম, স্ট্রেঞ্জ, টপ আর বটম। এরা এবং এদের সমাহারে তৈরি কণারা, যেমন প্রোটন, নিউট্রন, যারা দৃঢ় বলে সাড়া দেয়, তাদের বলে হেড্রন। দ্বিতীয় জাতটা লেপ্টন। তার মধ্যে আছে ইলেকট্রন, মিউঅন, টাওঅন, তার তাদের সঙ্গী নিউট্রিনো। এই সব ফের্মিঅনদের উল্টো কণাও আছে, যা সারণীতে দেখানো হয়নি।

বোসন কণাদের মধ্যে আছে ফোটন (γ), গ্লুয়ন (g), Z এবং দুরকম ডব্লু, লেখা হয় $W^\pm$। আর আছে হিগস ক্ষেত্রের বাহক হিগস বোসন। এই সব কণা, তাদের ধর্ম এবং তাদের মধ্যে আদানপ্রদানের নিয়মনীতি মিলে মৌলকণাদের যে তত্ত্ব তাকেই বলে স্ট্যান্ডার্ড মডেল।

* * *

তত্ত্ব না হয় হল, কিন্তু তত্ত্বটা যে ঠিক তা বোঝা যাবে কী করে? সারণীর ঘরগুলোতে যে সব কণার থাকার কথা তাদের খুঁজে পেলে তবেই বলা যাবে ঠিক পথেই এগোচ্ছি। এইভাবে 'কী খুঁজছি, জেনে বুঝে' খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার হল একের পর এক কণা। কিন্তু গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে হাজার প্রচেষ্টাতেও ধরা দিচ্ছিল না একটা কণা— হিগস বোসন। যদি এই কণা সত্যিই না থাকে তবে স্ট্যান্ডার্ড মডেল ভুল। কণাদের জগত সম্বন্ধে আমাদের বেশিরভাগ ধারণাই ভুল। আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে। তত্ত্ব তৈরি করতে হবে একেবারে শুরু থেকে। এ প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছিল। কিন্তু জ্ঞানজগত এগোতে পারছিল না বেশিদূর। অপর দিকে স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে ধরে নিয়েও বেশি দূর তত্ত্ব গড়তে ভয় পাচ্ছিলেন বিজ্ঞানীরা। যদি দেখা যায় স্ট্যান্ডার্ড মডেলের তত্ত্বটা ভুল, তবে? গবেষণা বিফল হবে।

বিজ্ঞান দাঁড়িয়েছিল একটা পাহাড়প্রমাণ বাধার সামনে। পাহাড় না সরিয়ে, তত্ত্ব ঠিক কি না না-বুঝে, এক পা এগোবার উপায় নেই। কিন্তু তত্ত্বকাঠামো যা দাঁড়িয়েছিল তাতে দেখা যাচ্ছে, এই কণা তৈরি হবে প্রায় আলোর বেগে গতিশীল প্রোটন কণার মুখোমুখি সংঘর্ষে। তৈরি হয়ে পরক্ষণেই ভেঙে যাবে। তৈরি হবে অন্য কিছু কণা, যাদের চরিত্র আমাদের জানা আছে। এদের চিহ্নিত করতে পারলেই বোঝা যাবে মাঝখানে হিগস বোসন কণা তৈরি হয়েছিল মুহূর্তের জন্য। এ বড় কঠিন পরীক্ষা।

এ জন্যই তৈরি হয়েছিল লার্জ হেড্রন কোলাইডার যন্ত্র। 'যন্ত্র' বললে আমাদের চোখে যা ভাসে তার চেয়ে অনেকগুণ বড় যন্ত্র। এই যন্ত্রে যে বৃত্তাকার সুড়ঙ্গ মাটির নিচ দিয়ে চলে গিয়েছে তার পরিধি হল ২৭ কিলোমিটার। এত বড় সুড়ঙ্গকে সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করতে হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে প্রোটনের স্রোতকে বিপুল গতিতে চালনা করতে হয়েছে। এ জন্য প্রয়োজন হয়েছে ৯৩০০টি অতিপরিবাহী চুম্বক, যার তারকে রাখতে হয়েছে ২৭১ ডিগ্রি তাপমাত্রায়। এক একটা প্রোটনের গতিবেগ দাঁড়িয়েছে আলোর গতির ০.৯৯৯৯৯৯ ভাগ, শক্তি ৭ টেরা ইলেকট্রন ভোল্ট। কোটি কোটি প্রোটনের দুটি ঝাঁক ওই সুড়ঙ্গে সেকেন্ডে ১১০০০ বার পাক খেতে খেতে পরস্পরের ওপর আছড়ে পড়েছে। তা থেকে যা তৈরি হয়েছে তা মেপেছে চারটি বড় ডিটেক্টর যন্ত্র, যাতে আছে ১৫০,০০০,০০০টি সেন্সর। অত তথ্য বিশ্লেষণ করা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মাপার সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তা পৌঁছে গিয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসানো হাজার হাজার কম্পিউটারে। একশো এগারটি দেশের হাজার হাজার বিজ্ঞানী একসঙ্গে তাকে বিশ্লেষণ করেছেন, এবং প্রাপ্ত তথ্য আদান প্রদান করছেন। এত কিছুর পরেও, যখন প্রথম হিগস বোসনের ইঙ্গিত পাওয়া গেল তখনও বিজ্ঞানীরা তা ঘোষণা করেননি, কারণ, যা পাওয়া গেছে তা 'পরিসংখ্যানের দিক থেকে যথেষ্ট' (স্ট্যাটিসটিক্যালি সাফিসিয়েন্ট) ছিল না। কোনও অজানা কারণে ওই ধরনের তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল ১/৫০০ (পাঁচশ ভাগের এক ভাগ)। বিজ্ঞানীরা একে আবিষ্কার বললেন তখনই যখন কোনও তথ্যবিচ্যুতিতে বা মাপার ভুলে এই রকম ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা ১/১,০০০,০০০ তে পৌঁছাল। ৪ জুলাই ঘোষণা করা হল, একটা নতুন কণা পাওয়া গিয়েছে যা প্রোটনের চেয়ে ১২৬ গুণ ভারী এবং এর ধর্ম স্ট্যান্ডার্ড মডেলের হিগস বোসন কণার প্রত্যাশিত ধর্মের সঙ্গে অনেকখানি মেলে। আরও পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে এটি প্রকৃতই হিগস বোসন কি না! যদি তা হয়, তবে তা হবে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। মনুষ্যসৃষ্ট তত্ত্বের এক বিরাট জয়।

(পরবর্তী সংখ্যায় দেখুন)

পুঁজিবাদী রাশিয়ার ২০ বছর

(সোভিয়েট সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে ১৯৯১ সালে, ফিরে এসেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে বিশ্বের পুঁজিপতি শ্রেণি। সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র থাকে না, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই গণতন্ত্রের পীঠস্থান — এ কথা মনে করেন যাঁরা, তাঁরাও নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ২০ বছর পার করেছে রাশিয়ার পুঁজিবাদ। কী অবস্থা আজ সেই দেশের? এ বিষয়ে কিছু তথ্য একত্রিত করে কানাডার নর্থ স্টার কম্পাস পত্রিকার সম্পাদক মাইকেল লুকাস রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে একটি খোলা চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটির অনুবাদ সম্পাদিত আকারে প্রকাশ করা হল।)

প্রিয় মিস্টার পুতিন,

রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার সম্যক অবগতির জন্য নর্থ স্টার কম্পাস-এর পাতায় আমি কিছু তথ্য প্রকাশ করছি, যাতে বিশ্বের ৬৯টি দেশের পত্রিকা পাঠকেরা জানতে পারেন, আপনার নির্দেশিত পুঁজিবাদী সংস্কার কী কী উপহার নিয়ে এসেছে। ভালো থাকবেন।

মাইকেল লুকাস, সম্পাদক, এন এস সি

যে বিষয়গুলিতে বিশ্বের প্রথম স্থান দখল করেছে পুঁজিবাদী রাশিয়া

● মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা, ● বয়স্ক মানুষের আত্মহত্যার সংখ্যা, ● বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদের আত্মহত্যার সংখ্যা, ● বাবা-মায়ের পরিত্যক্ত শিশুর সংখ্যা, ● গর্ভপাত ও প্রসবকালীন মৃত্যুর সংখ্যা, ● বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের সংখ্যা, ● মাদকের ব্যবহার, ● তামাকের ব্যবহার, ● হার্ট ও ধমনীসংক্রান্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যা, ● পথ দুর্ঘটনা, ● বিমান দুর্ঘটনা, ● চীনা গাড়ি আমদানি, ● ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ।

যে যে বিষয়ে দ্বিতীয় স্থানে

● জাল ওষুধের প্রসার, ● ধনপতিদের সংখ্যা, ● মোট জনসংখ্যার অনুপাতে আত্মহত্যার সংখ্যা, ● জনসংখ্যার অনুপাতে খুনের সংখ্যা, ● গত দশ বছরে নিহত সাংবাদিকের সংখ্যা, ● পশ্চিমের দেশগুলিতে আশ্রয়প্রার্থী মানুষের সংখ্যা, ● আমলাতন্ত্রের প্রসার, ● প্রতি হাজার জনে জেলবন্দীর সংখ্যা, ● মার্কিন নাগরিকদের দ্বারা দত্তক নেওয়া শিশুর সংখ্যা।

তৃতীয় স্থান

● সিগারেট উৎপাদন, ● চাইল্ড পর্নোগ্রাফি (শিশুদেহ নিয়ে অশ্লীল পত্রপত্রিকা, ছবি ইত্যাদি), ● ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংখ্যা, ● গাড়ি চুরির সংখ্যা।

বিশ্বে ৬২তম স্থান যে বিষয়গুলিতে

● প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

৬৭তম স্থান

● জনগণের জীবনযাত্রার মান

৭০তম স্থান

● আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রযুক্তির ব্যবহার

৭২তম স্থান

● রাশিয়ার সরকার কর্তৃক মাথাপিছু ব্যয়

৯৭তম স্থান

● মাথাপিছু আয়

বিশ্বে ১৩৪তম স্থান

● জনগণের আয়ুষ্কাল

এই হল পুঁজিবাদী রাশিয়ার আজকের হাল। ভাবতে কষ্ট হয়, স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই দেশের সমস্ত মানুষের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। খাবার কিনতে জনগণকে খরচ করতে হত অতি সামান্য অর্থ। স্ট্যালিনের পরিকল্পনা ছিল খাবার পুরোপুরি ফ্রি করে দেওয়ার। শ্রমিকদের কাজ করতে হত সারা দিনে মাত্র ৬ ঘন্টা। তাদের লক্ষ্য ছিল সেটাকে কমিয়ে ৪ ঘন্টা করার। বাকি সময়টা বরাদ্দ ছিল সুস্থ বিনোদন ও নানা সৃষ্টিশীল কাজে মগ্ন হওয়ার জন্য। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতা দখল করে সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ ও তার সহযোগীরা। সমাজতন্ত্রকে কবরে পাঠিয়ে কায়েম করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। সেই শুরু। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের প্রেসিডেন্ট পুতিনের রাশিয়া এই চেহারা নিয়েছে।

বাসদ-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ঢাকায় জনসভা ও মিছিল

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর ৩২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও মহান রুশ বিপ্লবের ৯৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে ২৩ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিশাল জনসভা হয়। এই সভায় সভাপতির ভাষণে বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, "দেশ আজ গভীর সংকটের সম্মুখীন। এ সংকট থেকে দেশ ও জনগণকে বাঁচাতে হলে দরকার ধনিকশ্রেণির দুর্বৃত্তায়িত নীতি-আদর্শহীন জোট-মহাজোট-এর বৃত্ত ভেঙে বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির উত্থান।"

জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দর চৌধুরী, কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, কমরেড জাহেদুল হক মিলু, কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সিপিবি-বাসদ ঐক্যের কেন্দ্রীয় নেতা, সিপিবি প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড হায়দার আকবর খান রনো। জনসভা শেষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মানব মুক্তির মতবাদ, সব হাতে কাজ চাই — সব মুখে ভাত চাই, বাঁচতে হলে দরকার মেহনতিদের সরকার ইত্যাদি দাবি সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন, লাল পতাকা সজ্জিত বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল প্রেসক্লাব থেকে শুরু হয়ে দৈনিক বাংলা, বায়তুল মোকাররম, গুলিস্তান, কাপ্তান বাজার মোড়, গোলাপশাহ মাজার, পল্টন মোড় হয়ে পুনরায় প্রেসক্লাবে শেষ হয়।

গণদাবীর বকেয়া গ্রাহক চাঁদা অবিলম্বে পাঠিয়ে পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করুন

গণদাবী সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানান

ফোন/ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৬৫-০২৭৬

ই-মেল ঃ ganadabi@gmail.com

ওবামার অশ্রুপাতকে খাঁটি বলা যাচ্ছে না

একের পাতার পর

গণতন্ত্রের জয়ধ্বনিতে গলা মেলাতে বলেন। এই 'ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্র' কী দিয়েছে মার্কিন নাগরিকদের? এক মার্কিন নাগরিকই এর জবাব দিয়ে বলেছেন, "এ এমন এক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে যা শিশুহত্যাকেও মেনে নেয় আবার শিশুদের শেখায় ওসব খুনোখুনি নিয়ে ভেবো না, ওসব স্বাভাবিক, সব ঠিকঠাক চলছে।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা স্যান্ডি স্কুলের শিশুহত্যার ঘটনায় বিবৃতি দিতে গিয়ে চোখের জল ফেলে বলেছেন, এই বেদনা এক পিতার। মাফ করবেন, ওবামার এই অশ্রুপাতকে খাঁটি বলা যাচ্ছে না। তা বলা যেত যদি দেখতাম ইরাকে, আফগানিস্তানে, হাইতিতে মার্কিন সেনার ও বোমার আক্রমণে নিহত শিশুদের জন্যও তিনি অশ্রুপাত করছেন, প্যালেস্টাইনে বর্বর ইস্রায়েলি আগ্রাসনে নিহত শিশুদের জন্যও তাঁর চোখে জল আসছে। বরং তিনি ও তাঁর 'গণতন্ত্র' সর্বদা মার্কিন শিশু-কিশোর-যুবক ও সাধারণ মানুষকে বোঝায় যে, মিথ্যা অভিযোগ তুলে ইরাককে অর্থনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ করে, তারপর বোমা মেরে হাজার হাজার শিশু হত্যা করে, আফগানিস্তানে প্রত্যহ ড্রোন আক্রমণে নারী-শিশু-বৃদ্ধদের হত্যা করে বিরাট ন্যায় ও মহৎ কাজ করছে আমেরিকা। মার্কিন ধনতন্ত্রের সামরিক আগ্রাসনে, আণবিক বোমাবর্ষণে আজও জাপানে যে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মায়, ভিয়েতনামে বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাসের প্রতিক্রিয়া আজও যে মা ও শিশুরা বহন করে, তাদের জন্য এক বিন্দু অশ্রুও যদি ওবামার চোখ থেকে পড়ত, বলা যেত সত্যই তিনি পিতা, সত্যই তিনি ব্যথিত বেদনাহত। নয়তো বলতেই হয় এ হল শাসকের পক্ষ থেকে মামুলি শোকপ্রকাশ।

শুধু আমেরিকা নয়, বিশ্বের সকল পুঁজিবাদী দেশেই গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার ডঙ্কা বাজিয়ে যে ভয়ানক সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তাতে দেশে দেশে আজ বিকৃত মনের কিশোর, যুবক ও মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। বাড়ছে পুঁজিবাদী ভারতেও।

প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের টেলিভিশন ও সিনেমার পর্দায় এখন খুন-জখম, হিংসা-প্রতিহিংসার ভয়ঙ্কর ছবি ও গল্প প্রায় ২৪ ঘণ্টা চলছে। কার্টুনেও এখন যুদ্ধ আর মারামারির ছড়াছড়ি। নিত্য নতুন চ্যানেল আসছে। অন্য দিকে সব পুঁজিবাদী সরকার শিক্ষায় সরকারি বরাদ্দ হ্রাস করছে! উচ্চশিক্ষা পেতে হলে বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা মাথায় নিতে হচ্ছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ চাকরির সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। আমেরিকা-ইউরোপেও খাদ্যকুপন নিয়ে লাইনে দাঁড়ানো মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। পাশাপাশি সামরিক বাহিনীর জয়গাথা প্রচার এখন প্রায় রুটিনে পরিণত হয়েছে। মার্কিন সামরিক কর্তারা তো স্কুলে-কলেজে গিয়ে বক্তৃতা করে ছাত্রদের শোনান— দেশে দেশে "ন্যায় ও শান্তি" প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন সেনাদের 'শৌর্য-বীর্যে'-র মোহময় কাহিনি। 'ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের' সংস্কৃতি এখন পুরুষ শিশুদের শেখায় 'কঠোর' হতে হবে, এমন দৈহিক শক্তি অর্জন করতে হবে যাতে অপরে তোমাকে ভয় পায়। পুঁজিপতি যেমন মুনাফার পথে যেকোনও বাধাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে এগোয়, তেমনই তুমি যা চাও বা পেতে চাও, তা যেভাবেই হোক পেতে হবে, সেজন্য অপরকে হত্যা করতেও পিছপা হয়ো না। শিশুদের মৌলিক অধিকার বলতে কোনও পুঁজিবাদী দেশে কিছু পাওয়া যাবে না। শিশু কিশোরদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকাশের, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি, সহিষ্ণুতা-সহমর্মিতা, গরিব মানুষের প্রতি, অসহায়দের প্রতি দরদ, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান ইত্যাদির মন গড়ে তোলার বদলে তাকে ধ্বংস করারই আয়োজন চারদিকে। সর্বদা শেখানো হচ্ছে — হিংসা-খুনোখুনি দেখে ঘাবড়িও না, এসব স্বাভাবিক, একে মেনে নাও, তুমি যা ভাবো, যা ঠিক মনে করো সেটাই ঠিক।

আর, মিডিয়ার ভূমিকা? অ্যাডামের ঘটনায় মার্কিন মিডিয়া ব্যস্ত হয়ে পড়ল ঘটনা সম্পর্কে নিহতদের সহপাঠীদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহে। কিন্তু কেন এসব ঘটছে, কেন অ্যাডামরা বিকৃত মনের খুনি হয়ে যাচ্ছে, সমাজের অসুখটা কোথায়— এসব নিয়ে গভীর অনুসন্ধানে তারা মন দিলনা। কারণ, এখন মিডিয়ার লক্ষ্য সর্বদা চাঞ্চল্যকর সংবাদ। বিশেষ কোনও ঘটনায় "চাঞ্চল্যকর" কিছু না থাকলেও মিডিয়া মালিকের হুকুম — এমনভাবে টিভিতে ও ছাপা সংবাদপত্রে তা প্রকাশ করতে হবে যেন তা দর্শক পাঠকদের চমকে দিতে পারে, চমকের অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে। এসব তো পুঁজিবাদেরই অবদান! পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও মুক্তচিন্তার বৈশিষ্ট্য। এভাবেই সর্বাত্মক সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমগ্র সমাজকে, শিশু-কিশোর-যুবক ও সাধারণ মানুষের মনকে বিষাক্ত ও পঙ্গু করে দিতে চাইছে।। পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রেখে সমাজের এই গভীর অসুখের শিকড় উৎপাটন করা যাবে না একথা ঠিক, কিন্তু নিয়তির মতো মানুষকে তা মেনে নিয়ে এর অসহায় শিকার হতে হবে, সে ধারণাও ঠিক নয়। প্রতিকূল পরিবেশকে সৃষ্টিশীলভাবে মোকাবিলা করতে পারার ক্ষমতাই মানুষকে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মৌলিকভাবে আলাদা করেছে। মানুষই পারে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া করতে। তারাই একমাত্র এর হাত থেকে নিজেকে ও পরিবারকে খানিকটা হলেও হয়তো রক্ষা করতে পারবেন, যারা নিষ্ঠুর ধনতন্ত্র ও মেকি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনে কোনও না কোনওভাবে নিজেদের যুক্ত রাখবেন এবং ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী সংস্কৃতির বিকল্প সামাজিক স্বার্থমুখী সংস্কৃতির চর্চা করার চেষ্টা করবেন, তাতে পরিবারের সকলকে জড়িয়ে নেবেন।

ঘুষের কারবারে ওয়ালমার্ট

একের পাতার পর

হলেও কর্পোরেট কোম্পানিগুলি তাদের বিপুল টাকার থলিকে যে প্রভাব বিস্তারের কাজে লাগায়, তা আজ আর কোনও গোপন তথ্য নয়। সরকারি ও বিরোধী বিভিন্ন দলের সাংসদরা এক একটি ধনকুবের গোষ্ঠীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করেন এ অভিযোগ বার বার উঠেছে। কোন মন্ত্রকে কোন মন্ত্রী বসবেন তাও নির্ভর করে ধনকুবের গোষ্ঠীগুলির লবির জোরের উপরে।

টুজি-স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে টাটা কোম্পানির লবিস্ট নীরা রাডিয়ার সঙ্গে রতন টাটার ফোন বার্তা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় দেশের মানুষ জেনেছিল কীভাবে সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করে এই ধনকুবেররা। কে জি বেসিনে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বাড়াতে না চাওয়ায় তৎকালীন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীকে যে আম্বানিদের চাপেই সরে যেতে হয়েছে, সে কথাও প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও টাকার জোরেই সেসব কিছু চাপা পড়ে গেছে।

বিভিন্ন সংস্থার হিসাবে ভারতে এই মুহূর্তে খুচরো ব্যবসার পরিমাণ ২৭ লক্ষ কোটি টাকা। অনুমান ২০২০ সালের মধ্যে এই পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৪ লক্ষ কোটি টাকা। ফলে ভারতের খুচরো ব্যবসার বাজার সংকটে জর্জরিত মার্কিন পুঁজির কাছে অতি লোভনীয়। যে কারণে প্রেসিডেন্ট ওবামা থেকে শুরু করে গোটা মার্কিন প্রশাসন, বহুজাতিক গোষ্ঠী এবং কূটনীতিকরা মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছে ভারতের খুচরো ব্যবসার বাজার বিদেশি পুঁজির জন্য খুলে দেওয়ার তদ্বির করতে। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির মালিকরাও চাইছে বিদেশি বহুজাতিকদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতের এই বিশাল বাজারের কিয়দংশ বিদেশি পুঁজির লাভের জন্য ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে একদিকে দেশীয় বাজারে আরও বেশি মুনাফা পেতে এবং ইউরোপ, আমেরিকা সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের বাজারে প্রবেশ করতে।

দেখা যাচ্ছে ওয়ালমার্ট যখন ভারতের বাজারে ঢোকার জন্য মার্কিন আইনসভার সদস্যদের ধরে লবি করে ভারত সরকারের মাথাদের উপর প্রভাব খাটাতে চাইছে, সে সময় টাটা সন্স, রিলায়েন্স ইন্ড্রাস্টিজ, র‍্যানবাক্সি-র মতো ২৭টি ভারতীয় কোম্পানি মার্কিন বাজারে ঢুকবার জন্য লবি করে চলেছে পাঁচ বছর আগে থেকেই। অস্ত্র ব্যবসা, পরমাণু শক্তি, বিদ্যুৎ ব্যবসার নাগাল পেতে টাটা সন্স মার্কিন কোহেন গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি করেছে। এ জন্য এই কোম্পানিগুলি বেশ কয়েক শত কোটি ডলার ঢেলেছে।

ওয়ালমার্ট এবং তার ভারতীয় সহযোগী ভারতি বলেছে, তারা ভারতে কোনও লবি করেনি বা ঘুষ দেয়নি। কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, যেখানে ভারতীয় বড় বড় দলের নেতারা সামান্য পেট্রোল পাম্পের ডিলারশিপ দিতেই কাটমানি চায়। এমনকী একশ দিনের কাজের প্রকল্পের মজুরি থেকেও কিছু পকেটে পোরে, সেখানে তারা এত বিশাল অঙ্কের লেনদেন দেখেও ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে বসেছিলেন, এ কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারে?

এ কথারও উত্তর দিতে হবে যে, বিএসপি, সমাজবাদী পার্টি, ডি এম কে-র মতো বেশ কয়েকটি দল, যারা আগে এফ ডি আই-এর বিরোধিতা করেছে, তারা সংসদে এ বিষয়ে ভোটাভুটির সময় হঠাৎ সরকারের পাশে দাঁড়ালো কেন? ভারতীয় সংসদে ভোট কেনা বেচার ইতিহাস তো বিরল নয়। কংগ্রেস, বিজেপি দু'জনেই এই কাজে হাত পাকিয়েছে আগেই। এ ক্ষেত্রেও এমন কিছু ঘটেনি, এ কথা কি হলফ করে বলা যাবে? সমাজবাদী পার্টি এ বিষয়ে বলেছে — "আমাদের সাংসদরা ইংরেজি জানে না, তাই তারা কোনও ঘুষ নেয়নি।" এসব কথা কী ইঙ্গিত করে? কংগ্রেস সহ সমস্ত সংসদীয় দলের নেতারা যে বিপুল বৈভবে দিনে কাটান, তার উৎস কোথায় সবাই জানে। এফ ডি আই ইস্যুতে একচেটিয়া মালিকরা বার বার সরকারি নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে যাতে এই নীতি ত্বরান্বিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের সম্বন্ধে যার ন্যূনতম ধারণা আছে, সেই বলবে টেবিলের তলার লেনদেন ছাড়া এত সক্রিয়তা রীতিমত আশ্চর্যজনক। সংবাদমাধ্যমও যেভাবে এফ ডি আই নিয়ে মানুষকে বোঝাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাতেও ধারণা হয় এ-ও 'লবিরই' মাহাত্ম্য।

আরও জানা গেছে ভারত সরকার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে এফ ডি আই-এর অনুমোদন দেওয়ার এক বছর আগেই ২০১১-এর সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ালমার্ট ও তাদের ভারতীয় সহযোগী ভারতির যৌথ সংস্থা সেডার সাপোর্ট কোম্পানিতে 'ওয়লমার্ট মরিশাস হোল্ডিংস'-এর মাধ্যমে ৪৫৫ কোটি বিনিয়োগ করা হয়। কেন্দ্রীয় শিল্প বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এস জগত রক্ষকন স্বীকার করেছেন যেভাবে এই বিনিয়োগ করা হয়েছে তা ফেমা আইনকে (ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট) লঙ্ঘন করে। ইক্যুইটিতে পরিবর্তনযোগ্য ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে করা এই শেয়ারের বলে ভারতির নামে দেশ জুড়ে চলা শপিং মল, রিটেল চেনগুলির আসল মালিকানা সরকারি ঘোষণার বহু আগেই ওয়ালমার্ট দখল করেছে। এ দেশের কোনও মানুষ বিশ্বাস করবে না যে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক মাথা ও আমলাকুলের চোখ এড়িয়ে এ ঘটনা ঘটেছে।

এ বিষয়ে একটা কথা না বললে চলে না, সংসদে বিজেপি, সিপিএম, তৃণমূল, বিজেডি-র মতো দলগুলি যারা এফ ডি আই-এর বিরোধিতা করার মহড়া নিয়েছে তারা কেউ-ই বিশ্বায়ন ও উদারিকরণের বিরোধিতা করেনি। অথচ এরই আবশ্যিক শর্ত হিসাবেই এসেছে খুচরো ব্যবসায় বহুজাতিক পুঁজির অনুপ্রবেশ ও এফ ডি আই। বিজেপি ক্ষমতায় থাকাকালীন খুচরো ব্যবসায় ২৬ শতাংশ এফ ডি আই-আনতে চেয়েছিল, তখন কংগ্রেস বিরোধী আসনে বসে তার বিরুদ্ধতা করেছিল। এখন নাটকের উল্টো অঙ্কটা অভিনীত হচ্ছে। বিরোধীদের আনা প্রস্তাবের উপর বিতর্কে সংসদে মন্ত্রী কপিল সিব্বাল এফ ডি আই কে সমর্থন করতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরির উদ্ধৃতি। বিজেপি, সিপিএম, তৃণমূল, বিজেডি যে যেখানে রাজ্যের ক্ষমতায় আছে তারা নানা বিষয়ে এফ ডি আই আনছে। তৃণমূল পরিষেবা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি খাতে এফ ডি আই-এর জন্য পশ্চিমবঙ্গে সওয়াল করছে।

দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ খুচরো ব্যবসার উপর নির্ভরশীল। তাদের পরিবারকে ধরলে প্রায় ২০ কোটি মানুষ অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রায় ২৪ শতাংশ খুচরো ব্যবসায় এফ ডি আইয়ের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে সর্বস্বান্ত হবে। এই বিরাট সংখ্যার মানুষের ভোটের দিকে তাকিয়ে লোক দেখানো কিছুটা গলা ফাটানোর বেশি কিছু এই দলগুলির পক্ষে করা সম্ভব নয়। কারণ এদের সকলেরই টিকি বাঁধা আছে বহুজাতিক পুঁজির সিন্দুকে। তার ভরসাতেই এদের রমরমা।

এদের ভূমিকা চিনে নিয়ে, সামগ্রিক ভাবে বিশ্বায়ন, উদারিকরণ, এফ ডি আই ও খুচরো ব্যবসায় বহুজাতিক পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনই এই সর্বনাশকে রুখতে পারে।

স্বল্পমূল্যের ওষুধ !

একের পাতার পর

কিনতে হবে না। সরকারের দুরভিসন্ধি সেদিন মানুষের গোচরে আসেনি। ঐ সব দোকান দেখিয়ে হাসপাতালে ক্রমশ তারা বিনা পয়সায় ওষুধের সাপ্লাই যে কমিয়ে দেবে তা তারা বলেনি। কিন্তু মানুষ আজ উপলব্ধি করতে পারছেন ঐসব 'জনওষুধী' দোকানের মায়াজাল দেখিয়ে সরকারি ওষুধ সাপ্লাই আজ কী পরিমাণে কমানো হয়েছে। অন্যদিকে সরকার ঐসব দোকানগুলিতে জেনেরিক নামের ওষুধ সরবরাহও করতে পারেনি। এবং ওষুধ কোম্পানিগুলিকে দিয়ে জেনেরিক নামে বেশি ওষুধ তৈরি ও বিক্রি করাতে পারেনি। জনওষুধী প্রকল্পের ঐসব দোকানে যে গুটিকয়েক ওষুধ বিক্রি হতো তার মান নিয়ে সেদিন চিকিৎসক মহলে প্রশ্ন উঠে যায়। নানা কারণে আজ ঐসব দোকানগুলির বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে গেছে অথবা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। মাঝখান থেকে সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় ওষুধের যোগান তলানিতে ঠেকেছে।

এতদসত্ত্বেও বর্তমান রাজ্য সরকার আবার ঐ একই রকম প্রকল্প অন্য নামে গ্রহণ করেছে এবং সরকারি হাসপাতালের ওষুধের যোগান যে প্রায় বন্ধ, তা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিতে নতুন করে সরকারি হাসপাতালের মধ্যেই 'ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান' খুলছে। প্রথম পর্যায়ে ৬টি দোকান খোলা হয়েছে।

খোলাবাজারে কেন ওষুধের এত দাম বৃদ্ধি ? এ বিষয়ে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের বক্তব্য, গ্যাটচুক্তিতে স্বাক্ষরের পর ওষুধ কোম্পানিগুলোর উৎপাদন, তার মান ও মূল্য নির্ধারণের উপর সরকারের কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। মাত্র কয়েকটি ওষুধের উপরই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ফলে ওষুধের বাজারমূল্য আজ আগুন ছোঁয়া। অথচ কি কেন্দ্র কি রাজ্য কোনও সরকারকে ওষুধের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণে কোনও পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। এ থেকে স্পষ্ট যে, বৃহৎ ওষুধ কোম্পানির স্বার্থরক্ষাই সরকারের উদ্দেশ্য।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালে সমস্ত রোগীর জন্য সব ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিনামূল্যে সর্বক্ষণ সরবরাহ করার দাবিতে আন্দোলন করছে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন। সংগঠনের বক্তব্য, প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি (১৯৮৩) চালুর পর থেকে ৯০-এর দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এ রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে ১৩২ রকম ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হত। স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণের নীতি গ্রহণের পর থেকে সরকার এই ওষুধের সরবরাহ ক্রমশ কমাতে থাকে। বর্তমানে সরকারি হাসপাতালে ৩০-৪০টির বেশি ওষুধ আজ আর পাওয়া যায় না (যার মধ্যে গজ, তুলো, ব্যান্ডেজ, স্যালাইনের বোতল, সূচ ইত্যাদি রয়েছে)। তাও আবার বেশিরভাগ সময়ে সরবরাহ বন্ধ থাকে।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সরকার হাসপাতালে ৮০টি ওষুধ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। সেই সময় প্রতিবাদ করেছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। কিন্তু সমস্ত প্রতিবাদকে গায়ের জোরে দমন করে সিপিএম সরকার এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করে। তার ফলে হাসপাতালে বিনা পয়সায় ওষুধ পাওয়ার অধিকার ব্যাপকভাবে খর্ব হয়ে যায়।

বাস্তবে সাধারণ মানুষ হাসপাতালে ওষুধ না পেতে পেতে ভুলেই গেছে যে, ওষুধ পাওয়ার অধিকার তার আছে। হাসপাতালে টিকিট চার্জ, বেড চার্জ, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে হাসপাতালে সহজে ভর্তির সুযোগ না পাওয়া, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানোর জন্য অনেক বিলম্বে ডেট পাওয়া, বারবার হয়রানি — এককথায় সরকারি প্রশ্রয়ে হাসপাতালে চূড়ান্ত অব্যবস্থা বেসরকারি নার্সিং হোম ব্যবসার চাহিদা তৈরি করে এবং তা গড়েও ওঠে। এইভাবে সরকারি ভূমিকা হাসপাতালের চিকিসা ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করে দেয়।

স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণের পিছনে রয়েছে পুঁজিপতিদের চাপ। পুঁজিপতিরা তাদের অলস পুঁজি বিনিয়োগের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সমস্ত পরিষেবা ও রাষ্ট্রপরিচালিত নানা সংস্থার বেসরকারিকরণের জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে পিপিপি মডেল হল একটি অন্তর্বর্তী রাস্তা।

আজ স্বাস্থ্যের অধিকার রক্ষা করতে হলে জনমোহিনী মোড়কের আড়ালে এইসব প্রতারণা প্রকল্প বন্ধ করার দাবি তুলতে হবে। মূল দাবি হবে, চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। হাসপাতালের সংখ্যা বাড়াতে হবে, তাতে ডাক্তার নার্স সহ চিকিৎসার যাবতীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলে চিকিৎসাকে সহজলভ্য করতে হবে। ওষুধের ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করে সরকারি উদ্যোগে ন্যায্য দামে ওষুধ সরবরাহ করতে হবে। এই কাজে সরকারকে বাধ্য করতে না পারলে জনসাধারণ চিকিৎসা পাবে না।

'রাষ্ট্র' নিবন্ধ প্রসঙ্গে

নভেম্বর মাসে গণদাবীর তিনটি সংখ্যায় মহান লেনিনের 'রাষ্ট্র' সম্পর্কিত একটি প্রখ্যাত ভাষণ প্রকাশ করা হয়েছে। ২৩-২৯ নভেম্বর সংখ্যায় শেষ কিস্তিতে একটি উপস্থাপনা নিয়ে কিছু পাঠক প্রশ্ন করেছেন। সংশ্লিষ্ট অংশটি হল —

"অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন সামন্ততন্ত্র ভাঙল, রাশিয়াতে ভেঙেছিল অনেক পরে ১৮৬১ সালে, তখন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বাতিল করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এল...।"

এই অংশ পড়ে কেউ কেউ বলেছেন, এই থেকে মনে হয় যেন ১৮৬১ সালেই রাশিয়াতে সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের পর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছিল, যা ইতিহাস বলে না। তবে কি অনুবাদে ভুল করা হয়েছে?

প্রথমত, ১৮৬১ সালে রাশিয়াতে সামন্ততন্ত্রের ভাঙন বলতে লেনিন আইন মারফত ভূমিদাসপ্রথা বিলোপ বুঝিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, উপরে উল্লিখিত অংশে 'রাশিয়াতে ভেঙেছিল অনেক পরে ১৮৬১ সালে' এই বাক্যটি আছে 'পেরেনথিসিস' বা মূল বাক্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কহীন প্রক্ষিপ্ত মন্তব্য হিসাবে। হয়তো বাক্যটির আগে ও পরে 'ড্যাশ' ব্যবহার করলে বা মূল বাক্যের পরে উল্লেখ করলে বিভ্রান্তি আটকানো যেত। এভাবে পড়লেই পাঠকরা ধরতে পারবেন, লেনিন সাধারণভাবে বিশ্বের দেশে দেশে কীভাবে প্রক্রিয়াটি এগিয়েছিল তা দেখিয়েছেন, ঐ সময়কার রাশিয়াতে নয়। যে পাঠকরা এই বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাই।

সম্পাদক, গণদাবী

আইনের সীমিত সুযোগ নিয়েই গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ান

আইনজীবী পার্টি সদস্যদের সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

এ রাজ্যে এস ইউ সি আই (সি) দলের সদস্য ও সমর্থক আইনজীবীদের একটি সভা ১২ নভেম্বর কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ, কমরেড মানব বেরা। সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে প্রথমেই বক্তব্য রাখেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী কমরেড ভবেশ গাঙ্গুলী। উপস্থিত অন্যান্য অ্যাডভোকেটদের মধ্য থেকেও অনেকে বলেন।

এদের বক্তব্য শেষে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এই মিটিংয়ে আমি বিচারের অবস্থা, বিচারপ্রার্থীদের অবস্থা এবং আপনাদের ভাবনাচিন্তা ভালো করে জানতে চেয়েছিলাম। কিছুটা জানার সুযোগ আজ হল।

আইনজীবীদের মধ্য থেকে আমাদের দলের সদস্য, আবেদনকারী সদস্য ও সমর্থকরা এই সভায় এসেছেন। অনেকেই আছেন যাঁদের অভিজ্ঞতা অনেক। বর্তমান পরিস্থিতি আপনাদের কাছে দাবি করছে, যার মধ্যে যতটুকু সমাজচেতনা, বিপ্লবের প্রতি আকুতি কাজ করছে তার ভিত্তিতেই নিজের করণীয় কাজ, বিপ্লবী হিসাবে নিজের ভূমিকা নির্ধারণ করা।

রাজতন্ত্র ভেঙে যখন প্রজাতন্ত্র এল, বুর্জোয়া গণতন্ত্র তখন বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল এই ধারণা এনেছিল। রাষ্ট্র, সরকার, কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি ও ধনীদের তরফ থেকে জনগণের উপর যে অন্যায় অত্যাচার চলে, তা রোধ করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়। গোড়ার যুগে আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন ছিল এবং প্রতিটি বিভাগের একটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা ছিল। সেই সময় শিক্ষক, চিকিৎসকদের মতোই আইনও পেশা হিসাবে ছিল মহৎ পেশা। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, অন্যায়ের হাত থেকে আইনের সাহায্যে মানুষকে যতটুকু রক্ষা করা যায়, সেজন্য কাজ করাই ছিল লিগ্যাল প্রফেশনের আদর্শ। এদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে চিত্তরঞ্জন দাশের মতো ব্যারিস্টার বিপ্লবীদের পক্ষে মামলা লড়তে গিয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে আন্দোলনে নামলেন। একটা মামলা তাঁর জীবন পরিবর্তন করে দিল।

কিন্তু সেই পুঁজিবাদ আর নেই। আজকের পুঁজিবাদে গণতন্ত্র শব্দটা আছে, কিন্তু গণতন্ত্র নেই। একচেটিয়া পুঁজি, লগ্নী পুঁজি এখন ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে ধনতন্ত্রের ছাতার তলায়। এখন একচেটিয়া মালিক টাটা-বিড়লা-আম্বানিদের জন্য আইন আছে, শ্রমিকের পক্ষে বাস্তবে কোনও আইন নেই। যদিও মার্কসবাদ দেখিয়েছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তিটাই ইনজাস্টিসের (অন্যায়ের) উপর দাঁড়িয়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা দাঁড়িয়ে আছে মালিকের লাভের উপর। মালিক যা লাভ করছে তা আসছে শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে শোষণ করে। এটা কি জাস্টিস (ন্যায়)? এই যে শোষণ, এই ইনজাস্টিস এ তো কোনও কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। কোনও সংবিধান এর বিরুদ্ধে কথা বলবে না। তাহলে এর ভিত্তিতে 'ইক্যুয়াল' কথাটির এ ব্যবস্থায় কোনও অর্থ থাকে না। ফলে যতটুকু আইন আছে তার সুযোগ একজন গরিব মানুষ পেতে পারে না। সাধারণ মানুষই বলে, যার টাকা আছে, তার থানা পুলিশ আছে, তার কোর্ট আছে। যার টাকা নেই তার কিছুই নেই।

স্বাধীন বিচার ও রায়দান খুব বিরল হয়ে গেছে। একটা কথা এসেছে 'কমিটেড জুডিসিয়ারি'। কার প্রতি কমিটমেন্ট? সমাজের প্রতি নয়। এই কমিটমেন্ট শাসক শ্রেণি, শাসক দলের প্রতি। তার ভিত্তিতেই অন্যায় বিচার, ইচ্ছামতো আইনের ব্যাখ্যা চলছে। সমাজসচেতন আইনজীবী হিসাবে এর বিরুদ্ধে আপনাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

আমাদের গোটা সমাজটা ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন। সভ্যতার ইতিহাসে এতবড় সংকট কোনওদিন আসেনি। একদিকে সমগ্র অর্থনীতি ভেঙে পড়ার মুখে, অন্যদিকে সমাজে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভয়াবহ সংকট। পারিবারিক জীবন, গ্রাম-জীবনও ভেঙে যাচ্ছে। একথা কেউ আগে ভেবেছিল যে, ৬ মাসের বাচ্চাকে ধর্ষণ করা হবে! ১৬ বছরের কিশোর ধর্ষণ করেছে ৬০ বছরের মহিলাকে! মেয়ে বাবার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনছে। আপনাদের কোর্টেই তো এইসব কেস হয়! এমন সব রাজনৈতিক নেতা তৈরি হচ্ছে, যারা সাধারণ সমাজবিরোধী চোর ডাকাতদের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

পুঁজিবাদের পচন আজ এতটাই যে, যারাই পুঁজিবাদের সেবা করছে তারা চূড়ান্ত অনৈতিক, অমানবিক হতে বাধ্য। নৈতিকতার সংকট, মনুষ্যত্বের সংকটের হাত থেকে কারও পরিত্রাণ নেই। আমাদের দলের সাথে যারা যুক্ত তারা ডাক্তার হোক, শিক্ষক হোক, আইনজীবী হোক তাদেরও নিজেদের রক্ষা করার জন্য চরিত্র রক্ষা করার জন্য লড়তে হয়। চতুর্দিকে যখন রোগের জীবাণু ঘুরছে তখন দলের খাতায় নাম থাকলেই আমি আমাকে রক্ষা করতে পারব না।

প্রতিমুহূর্তে মানুষকে যেমন অক্সিজেন নিয়ে কার্বনডাই অক্সাইড ছেড়ে দিতে হয়, না হলে বাঁচা যায় না, চরিত্র অর্জনের ক্ষেত্রেও তেমন করে লড়তে হয়। একদিন হয়তো চরিত্র ভালো ছিল, কৈশোর-যৌবনে অনেক সুন্দর স্বপ্ন ছিল, সুন্দর মন ছিল। কিন্তু সমাজের ধুলোবালি পাঁক জমে সব নষ্ট করে দেয়। প্রচলিত জীবনের প্রবল স্রোত যে দিকে ঠেলতে চায়, তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার শক্তি না থাকলে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

পুঁজিবাদের গোড়ার যুগের ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা এখন পরিণত হয়েছে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায়, ব্যক্তির যথেচ্ছাচারে। আমার যা ইচ্ছা তাই করব, এবং শুধু টাকা রোজগার, স্ফূর্তি, আনন্দ — এই হবে লক্ষ্য। কিন্তু কোন আনন্দ আমরা চাই? বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, সুভাষ বোসেরও তো আনন্দ ছিল। ফাঁসির মঞ্চে ক্ষুদিরামেরও আনন্দ ছিল। কিন্তু সে আনন্দের বদলে এখন এসেছে টাকা, আরও টাকা রোজগার থেকেই আনন্দ। গাড়ি-বাড়ি, আরাম-আয়েশ, দেশভ্রমণ এই চাওয়ার যেন শেষ নেই। ভোগবাদ শেখায় আরও চাই, চাওয়ার কোনও শেষ নেই, অপ্রাপ্তির দুঃখ সর্বদা যেন তাড়া করছে, কোনও শান্তি নেই। ভোগবাদী জীবনধারণ মানে ব্যক্তি সমাজ থেকে নেবে, সমাজকে কিছু দেবে না। এই কি রুচিসম্মত জীবন? শুধু বেঁচে থেকে লাভ কী? বেঁচে থাকার জন্য জন্তুরাও তো খাদ্য সংগ্রহ করে, বংশবৃদ্ধি করে। মানুষের মতো বেঁচে থাকতে হলে মর্যাদাময় জীবন চাই। আমাদের শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন — বিপ্লবের কাজ না করে আমরা পারি না কেন? কারণ বিপ্লবের জন্য কাজ করার মধ্যেই রয়েছে মানুষের মর্যাদা। এই যুগটা সর্বহারা বিপ্লবের যুগ। সর্বহারা বিপ্লবের আদর্শ মার্কসবাদ। তাকে হাতিয়ার করে কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের দেখিয়েছেন রুচিসম্মত জীবন কোনটা।

আপনাদের জীবিকার মধ্যে অনেক টাকার হাতছানি আছে। অন্যদিকে নৈতিক পথে চললে অনেক প্রবলেম, অনেক অসুবিধা আছে। এই সংগ্রাম জীবনে করতে হয়। মনে রাখবেন, প্রফেশনে অনৈতিক কিছু থাকলে তার প্রভাব পারিবারিক জীবনেও পড়ে। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে একটা নীতিবোধ, আদর্শ নিয়ে চললে পরিবারেও তার প্রভাব পড়ে। চরিত্রকে সবসময় ক্ষুরধার রাখতে হয়। এতটুকু ছাড় দিলে হয় না। একটু একটু আপস করলেও চরিত্রের মান আস্তে আস্তে পড়তে থাকে। এটা একটা অল আউট ব্যাটেল। পরিবারকেও পার্টিটা বোঝান, চেষ্টা করার পরও পরিবার না বুঝলে আলাদা কথা।

আজ আর প্রচলিত আইন দিয়ে বর্তমানের ন্যায়কে রক্ষা করা যায় না। যতটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার বুর্জোয়া রাষ্ট্রও একসময় দিয়েছিল, সেটুকুও নানা কালা আইনের দ্বারা হরণ করছে। আপনাদের ভালো করে পড়াশুনা করে বুঝতে হবে — কী ছিল আর কী হচ্ছে! এই শোষণমূলক বুর্জোয়া রাষ্ট্রে আইন ব্যবস্থা, ন্যায় ধর্ম, ন্যায়বিচার এইসব কথার আড়ালে চলা অন্যায়, অধর্মকে আপনারাই পারেন মানুষের চোখে ভালোভাবে তুলে ধরতে। এই আইন কার, কাকে সেবা করে এই আইন ব্যবস্থা, কোন শ্রেণির পক্ষে কাজ করছে আধুনিক আইন শাস্ত্র — এগুলো ভালো করে দেখিয়ে দিতে হবে। বহু মক্কেল আপনাদের কাছে আসেন, তাদের কাজ করতে করতেও এই বিষয়গুলো তাদের ধরাতে হবে। কেন এই ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব নয়, তা আপনাদের পক্ষেই স্পষ্টভাবে বোঝানো সম্ভব। এটাও একটা সংগ্রাম।

আবার, এখনও এই ব্যবস্থাতেও আইনের ক্ষেত্রে যতটুকু সুযোগ আছে তা কাজে লাগিয়ে গরিব মানুষ, অত্যাচারিত মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে সর্বাত্মকভাবে লড়ুন। আমাদের কিছু ডাক্তার কমরেডরা যেমন করে করছে, লইয়ারদেরও বলব, আপনাদের প্রফেশনের ক্ষেত্রে যে স্ট্রাগল, তা টাকা রোজগারের জন্য নয়। এক্ষেত্রে সংযম রক্ষা করতে হবে। মোটামুটি চলার মতো যতটা দরকার ততটার বেশি চাই না। এই মোটামুটি শব্দটারও একটা সীমা আছে। আপনার বিবেকই পারে এর সীমা ঠিক করতে। না হলে এর কোনও শেষ নেই। অনেকে তো কত অনৈতিক পথে টাকা রোজগার করছে। আমাদের, আপনাদের বাবা-মায়েরা অনৈতিক পথে রোজগারের কথা ভাবতে পারতেন না। সমাজ যে ধ্বসে যাচ্ছে তার প্রভাব আমাদের কর্মীদের উপরেও পড়ছে। আমাদের বাবা-কাকা-মায়েদের মধ্যে পরিবারে সকলকে নিয়ে চলার মন কাজ করত। আজ সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পার্টির শিক্ষা হল — আগে মাকে দেখ, তারপর স্ত্রীকে দেখবে। ভাইবোনেদের আগে দেখে তারপর নিজের ছেলেকে দেখ। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা এগুলি মানব জীবনকে সুন্দর করে, যদি তা বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়।

কেউ যদি নাও বলে দেয় আমি কোনও অন্যায় করেছি, তাহলেও আমার বিবেকের সামনে তো আমি অপরাধী! কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন — নিজেকে রক্ষা করতে হলে দরকার জনগণের প্রতি দরদবোধ। রাস্তায় রাস্তায় যে বৃদ্ধা মহিলারা ভিক্ষা করছে তাদের চোখের জলের মধ্যেই আছে আমার মায়ের চোখের জল। ফুটপাথে একটা মেয়ে কাঁদছে তার বাচ্চাকে কী খাওয়াবে ভেবে। আর আমরা নিজের স্ত্রী সন্তানের কথা নিয়ে মগ্ন। এভাবে তো বিবেক বাঁচে না।

আইনজীবী হিসাবে আপনারা দলকে বিরাট সার্ভিস যেমন দিতে পারেন, তেমনই আপনাদের মধ্য থেকেই তৈরি হতে পারে বিপ্লবের পক্ষে, সাধারণ মানুষের পক্ষে কাজ করবে এমন একদল আইনজীবী, যারা সাহসের সঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।

পুরুলিয়া জেলা বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন ঝালদায়

পুরুলিয়া জেলার বিস্তীর্ণ অংশের দারিদ্র-পীড়িত মানুষ বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তাঁদের জন্য সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি বলে কিছু নেই। মালিকরা শ্রমআইন মানেন না। এই শিল্পে এতদিন সিটু মালিকদের স্বার্থই রক্ষা করেছে। শ্রমিকরা এখন এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বিড়ি শ্রমিক সঙ্ঘের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। ৭ ডিসেম্বর ঝালদায় অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের তৃতীয় জেলা সম্মেলনে পি এফ, চিকিৎসা সহ কল্যাণ দপ্তরের সমস্ত অধিকারগুলি কার্যকর করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি গৃহীত হয়। সম্মেলন থেকে সুফল কুমার সভাপতি ও রঙ্গলাল কুমার সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এস এস ঠাকুর।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

পরিষদীয় সচিবের পদ সৃষ্টি অপ্রয়োজনীয়

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ১৩ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

আজ রাজ্য বিধানসভায় 'দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল পার্লামেন্টারি সেক্রেটারিজ (অ্যাপয়েন্টমেন্ট, স্যালারি, ওয়েজস অ্যান্ড মিসলেনিয়াস প্রভিশনস বিল, ২০১২)' গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিলের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। এই আইনের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি সরকারি দপ্তরে একজন করে পরিষদীয় সচিব নিযুক্ত করা হবে, যারা সরকারি কাজের কো-অর্ডিনেট করবে এবং এদের পদমর্যাদা হবে প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের। এই বিলে বলা হয়েছে, বিধানসভার সদস্য সংখ্যার ১৪ শতাংশকে মন্ত্রী করা যাবে। ফলে এই বিলের সুযোগ নিয়ে আরও অনেক বিধায়ককে মন্ত্রী পর্যায়ে উন্নীত করা হবে এবং যার জন্য সরকারের ব্যয় আরও বাড়বে। যখন মুখ্যমন্ত্রী প্রবল অর্থ সংকটকে দেখিয়ে বলছেন, এই রাজ্যকে নিলামে দিলেও কেউ কিনবে না, সেখানে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এই ব্যয়বৃদ্ধির কোনও যৌক্তিকতাই নেই। ইতিপূর্বে কিছু এম পি-কে রাজ্যের মন্ত্রীদের মাথার উপরে বসানো হয়েছে তাতেও বেশ কিছু ব্যয়বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে আমরা অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহারের দাবি করছি।"

মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে সিইএসসি দপ্তরে বিক্ষোভ

সিইএসসি একটি লাভজনক সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে মাশুলবৃদ্ধি করার বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার শতাধিক সদস্য ৫ ডিসেম্বর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল করে সিইএসসি-র ভিক্টোরিয়া দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। সেখানে বিরাট পুলিশবাহিনীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অর্ডার কপিতে অগ্নিসংযোগ করেন।

অ্যাবেকার পক্ষ থেকে সিইএসসি-র ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের উদ্দেশে এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। তাতে বলা হয়েছে, অন্যায়ভাবে মাশুল ৬.০৩ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৬.০৯ পয়সা করা হয়েছে। ফলে আপাতভাবে ৬ পয়সা মাশুল বৃদ্ধি বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে ৬ পয়সা হিসাবে ৮ মাসে গ্রাহকদের থেকে ২৫৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা বকেয়া আদায় করা হবে।

আমরা এই চালাকির আশ্রয়ে বাড়ানো বর্ধিত মাশুল ও বকেয়া প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় রাজ্য জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হবে।

সভায় বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার রাজ্য সহসভাপতি অনুকূল ভদ্র ও কুনাল বিশ্বাস। ৭ থেকে ১৫ ডিসেম্বর অ্যাবেকার পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে বিদ্যুৎ অফিসগুলোতে বিক্ষোভ-ঘেরাও অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

ঝাড়খন্ডে আন্দোলনের জয়

ঘাটশিলার কাছে রাকা মাইনসে বিচিত্রানুষ্ঠানের নামে অশ্লীল অনুষ্ঠানের প্রতিবাদে ৪ ডিসেম্বর স্থানীয় জনগণকে নিয়ে এ আই এম এস এস এবং এ আই ডি এস ও জামসেদপুর ডি সি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। কর্তৃপক্ষ পরে এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

লোবার জমি আন্দোলনে চাষিরা ঐক্যবদ্ধ

পরেশ বাউরির তিন ফসলি তিন বিঘে জমি। ধান, সর্ষে, সব্জি সব কিছুই হয় এই জমিতে। দিলীপ রুইদাস, অজিত বাগদি ভাগচাষি। সোনাপতি বাগদি খেতমজুর। এঁরা এসেছিলেন কলকাতায়। সুদূর বীরভূমের দুবরাজপুর থানার লোবা গ্রাম থেকে। এখানকার মানুষ কলকাতায় সহজে আসতে চান না। কিন্তু আন্দোলনের তাগিদ তাদের নিয়ে এসেছিল অতি ব্যস্ত এই শহরে। ১৩ ডিসেম্বর রানি রাসমণি রোডে কৃষি জমি রক্ষা কমিটির সভায় হাজির

কলকাতার অবস্থানে এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর (ডানদিক থেকে দ্বিতীয়)

হয়েছিলেন অসংখ্য কৃষক। এদের কেউই এখনও জমি দেননি। যাদের জমি নেই সেই খেতমজুররাও সামিল এই লড়াইয়ে। রোদে পোড়া, সারাদিন মাঠে চাষের কাজে খেটে খাওয়া মানুষগুলো তাদের ভাষায় জানিয়ে গেল তাদের দাবি। তাদের রুটি রুজির একমাত্র হাতিয়ার চাষের জমি, তাদের বসত বাড়ি, পশুচারণের জমি, ছেলে মেয়েদের পড়ার স্কুল সবকিছু চলে যাবে। তারা যাবে কোথায়? থাকবে কোথায়? খাবে কী? অন্ধকার ভবিষ্যত জীবনের আশঙ্কা তাদের লড়াইয়ের ময়দানে টেনে এনেছে।

লোবা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১০টি মৌজার ৩৩৫৩ একর জমিতে মাটির তলায় আছে কয়লা। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ডিভিসিকে এই কোল ব্লক দিয়েছে। ডিভিসি নিজে কয়লা তোলে না। তারা বেসরকারি মালিক বেঙ্গল এমটার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে 'ডিভিসি এমটা' কোম্পানি গড়ে তুলে লোবার জমির তলায় কয়লা তোলার প্রকল্প নেয়। এই কোম্পানি কৃষকদের কাছ থেকে অত্যন্ত কম দামে এ পর্যন্ত মাত্র ২০০ একরের কিছু বেশি জমি নিতে পেরেছে। মূলত যারা লোবায় থাকেন না সেই সব জমির মালিক তাদের জমি বিক্রি করে দিয়েছেন ব্যক্তিগত ভাবে। কিন্তু লোবায় যারা বাস করেন তারা তাদের জমি দেননি। তারাই প্রথম সেখানকার ভাগচাষী, বর্গাদার, খেতমজুরদের সাথে আন্দোলনের মঞ্চ গড়ে তোলেন। সিপিএম সরকারের জমি অধিগ্রহণের নীতির বিরুদ্ধে ২০০৮ সাল থেকে এই আন্দোলন চলছে। তৎকালীন বিরোধী দল বর্তমানে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস তখন আন্দোলনে থাকলেও আজ তারা চাষিদের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

১৩ ডিসেম্বরের অবস্থানে এস ইউ সি আই (সি) কে আহ্বান জানায় কমিটি। চাষিদের সামনে তাদের আন্দোলনে সমস্ত রকমের সাহায্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক তরুণ নস্কর। তিনি লোবার মানুষকে তাদের দীর্ঘ ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের জন্য সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি) দল প্রথম থেকেই আছে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে এই দলই প্রথম আন্দোলন শুরু করে। লোবাতেও প্রথম থেকেই সমর্থন জানানো হয়। জমি যদি নিতে হয় তাহলে জমির তলায় যে বহুমূল্য কয়লা আছে তার অর্থমূল্যও জমির মূল্যের সাথে যুক্ত করে জমির দাম নির্ধারণ করার দাবি তিনি জানান। এই আন্দোলন ভাঙতে গুলি চালিয়েছে তৃণমূল সরকার। পাঁচ জন গ্রামবাসী পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন। জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যে তৃণমূল ক্ষমতায় গেছে তারাই মসনদে বসে আজ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বলছে, লাঠি গুলি চালাচ্ছে। মিথ্যা মামলায় আন্দোলনকারীদের হয়রানি করছে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে। নন্দীগ্রামের জন্য বুদ্ধবাবুরা পুলিশের উপর দায় চাপিয়েছেন, লোবার গুলিচালনার জন্য মমতা ব্যানার্জী পুলিশকে দুষেছেন। দৃষ্টিভঙ্গি এক, অর্থাৎ সরকারের যেন দায় নেই। তাহলে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যই কি এরা আন্দোলনকে ব্যবহার করেন? মমতা বন্দোপাধ্যায় লোবায় গিয়ে কমিটির মঞ্চেনা যাওয়ার তীব্র নিন্দা করেন কমরেড তরুণ নস্কর

তিনি কৃষি জমি রক্ষা কমিটির নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে বলেন, যারা সত্যই জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে নীতিগত ভাবে লড়ছেন, তাদের পরামর্শ নিন। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় নয়, আন্দোলন করতে হবে আপনাদের নিজেদেরকেই। আপনারাই সিদ্ধান্ত নেবেন কী ভাবে কোন পথে যাবেন। তবে সাম্প্রদায়িক শক্তি থেকে দূরে থাকতে হবে কমিটিকে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক।

অন্যায় বদলি রদের দাবিতে নার্সদের বিক্ষোভ

নার্সিং স্টাফদের নাইট অফের দাবিতে আন্দোলন গত ২১ নভেম্বর জয়যুক্ত হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে নার্সিং কর্মচারীদের সংগ্রামী সংগঠন নার্সেস ইউনিটি। জয়ের ফলে ক্ষিপ্ত সরকার অত্যন্ত গোপনে কলকাতার এন আর এস হাসপাতালে কর্মরত নার্সেস ইউনিটির সম্পাদিকা সিস্টার পার্বতী পাল-কে উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাত জেলা হাসপাতালে বদলি করে দেয়। বদলির আদেশ ২৯ নভেম্বর ইস্যু করা হলেও তিনি হাতে পান ১৪ ডিসেম্বর। গোপনে এইভাবে বদলির ষড়যন্ত্র যে নার্সিং আন্দোলনকে ভাঙার জন্যই, তা বুঝতে নার্সিং কর্মচারীদের কোনও অসুবিধা হয়নি। সিস্টার পার্বতী পাল বর্তমানে অসুস্থতার কারণে ছুটিতে আছেন। ১৭ ডিসেম্বর শতাধিক নার্সিং কর্মচারী এন আর এস হাসপাতালে নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট-এর কাছে এ অন্যায় বদলির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখায়। সুপারিনটেনডেন্ট বলেন, এই বদলির কথা তাঁকেও জানানো হয়নি। আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য এই বদলিকে ষড়যন্ত্রমূলক বলে অভিহিত করে অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করার জন্য নার্সেস ইউনিটি দাবি জানায়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in